আলোক-লতা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায

এম্‌, সি, সরকার এণ্ড সন্স্‌,
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা
দেড় টাকা

প্রকাশক
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

এস, সি, চৌধুরী,
ফিনিক্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২৯নং কালিদাস সিংহের লেন্।
কলিকাতা।

আমার অন্তর-লোকের আলোক-লতা,

তোমাকে দিলাম

আমার কল্প-লোকের আলোক-লতা।

My gloomy heart it loves thee,
It loves thee in every spot,
It breaks, it bleeds, it shudders—
But thou, thou seest it not.

—Heinrich Heine.

১৫ বৈশাখ ১৩২৭।

আলোকপ্রভা

কলিকাতার একটা গলির মধ্যে একটা বাড়ীর পিছন দিকের একটা এঁদোপড়া একতলার ঘরে পাঁচ-ছয় বছরের একটি ছোট্ট রুগ্ন মেয়ে বিছানায় পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতে হইতে ক্ষীণ দুর্ব্বল কাতর কণ্ঠে কাঁদিতে-ছিল—দিদি, দিদি, দিদি!

একটি তরুণী একটি মাটির প্রদীপের শিখাটিকে হাতের আড়াল দিয়া বাতাসের ঝাপ্‌টা হইতে বাঁচাইয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিয়া উঠিল—উঠেছিস্ ভাই অনু? তোর জন্যে পুঁটি-মাসী কেমন সুন্দর খুকী এনেছে!

অনু কাঁদিয়া উঠিল—কৈ খুকী?

“দাঁড়া ভাই দিচ্ছি, পিদ্দিমটা রাখি আগে।” বলিয়া তরুণী মলিনা মাটির পিল্‌সুজের উপর মাটির প্রদীপটি বসাইয়া কাঠি দিয়া সলিতাটা উস্কাইয়া দিল। তারপর একটা পোড়া মাটির মোটা-সোটা দুম্বো পুতুল কোলঙ্গা হইতে তুলিয়া লইয়া হাসিমুখে অনুর বিছানার কাছে আসিল। মলিনা বোনের রোগশয্যার পাশে বসিয়া পুতুলটি তার চোখের সাম্‌নে ধরিয়া হাসিমুখে বলিল—কেমন সুন্দর খুকী তোমার—খোঁপা বাঁধা, খোঁপায় আবার চিরুণী, ফুলকাঁটা, নাকে নথ, কানে সার মাকড়ী! বাঃ অনু! তোমার খুকীকে কাল আবার ভালো ভালো কাপড় জামা তৈরি কোরে দেবো!

অনু রোগক্লান্ত অবসন্ন দৃষ্টিতে একবার পুতুলটির দিকে দেখিয়াই হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া কান্নার স্বরে বলিয়া উঠিল—ও কেন? ও ত খুকী নয়, ও ত মুগুরদাসী! ও আমি নেবো না:.....

শিশুর রোগখিন্ন আব্দারের স্বর বড় করুণ হইয়া তার দিদির কানে বাজিল। দিদির সেই চেষ্টার হাসি তখনি ঠোঁটে মিলাইয়া গেল, বিষণ্ণ কাতর মুখ অনুর মুখের উপর রাখিয়া সে আদরের স্বরে বলিল—তবে কেমন খুকী নিবি ভাই? সেই ঘাঘ্‌রা-পরানো, পেট টিপ্‌লে প্যাঁক-প্যাঁক করে, চোখ বোজে, করতাল বাজায়.. ...

অনু বিরক্ত হইয়া আবার বলিয়া উঠিল—না, সে কেন?

মলিনা অনুর ঝুপ্‌ঝুপে চুলগুলি কপাল্ হইতে মাথার দিকে হাত বুলাইয়া তুলিয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল—তবে কেমন খুকী নেবে ভাই?

অনু দিদির গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সেই যে রাস্তায় থাকে, হামাগুড়ি দ্যায়, কাঁদে......

মলিনা হাসিয়া অনুর গালের উপর গাল রাখিয়া আদর করিয়া বলিল—তেমন খুকী কোথায় পাব ভাই, খুকীদের মা দেবে কেন? আজকে আবার পুঁটি-মাসী তোমার জন্যে পূজোর কাপড় নিয়ে আস্‌বে।

অনু উৎসুক আগ্রহে বলিয়া উঠিল—কখন্ আস্‌বে?

—এইবার আস্‌বে ভাই। সন্ধ্যে হয়েছে, এই এল বোলে।

—আমি শুধু কাপড় নেবো না। ও-ঘরের খুদির মতন আমি ফেরাক নেবো......

মলিনার মুখ মলিন হইয়া গেল, তার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে ধরা গলায় বলিল—অনু ভাই, একটু বার্লি খাবি?

অনু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না-আ, আমি বার্লি খাব না। ডাক্তার যে আমাকে বেদানার রস খেতে বলেছে......

মলিনার চোখ দিয়া বেদনার ধারা ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে বোনের নিকট হইতে অশ্রু গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

এমন সময় ঘরের ভেজানো দরজা সন্তর্পণে ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিল এক বৃদ্ধা। সে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিল - অনু কেমন আছে মলিনা ?

মলিনা চোখ মুছিয়া বৃদ্ধার কাছে সরিয়া গিয়া বলিল—ভালো নয় মাসী ; বড় ছটফট করছে আর বায়না নিচ্ছে—আমার অনু এমন অশান্ত ত ছিল না।

এই কথা বলিতে বলিতে মলিনার স্বর ধরিয়া আসিল। বৃদ্ধা বলিল —রোগের যন্ত্রণা মাসাবধি ভুগ্‌তে নেগেছে, ছেলেমানুষের কচি প্রাণ, ওর আর দোষ কি মা ? জেগে আছে ?

মলিনা রুদ্ধ স্বরে বলিল—হ্যাঁ।

বৃদ্ধা অনুর কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া বলিল—মা অনু, মা দুগ্‌গো তোমাকে কেমন কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন ছাখো !

অনুর রোগ-পাণ্ডুর মুখে ঈষৎ আনন্দের রক্তিমা জাগিল, নিষ্প্রভ চোখ দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, স্বরে একটু আগ্রহ বাজিল—কৈ পুঁটিমাসী ?

পুঁটি একটা কাগজের মোড়ক খুলিয়া একখানা পেঁয়াজী রঙের চৌখুপি ডুরে কাপড় বাহির করিল ও তার পাট খুলিয়া অনুর মুখের সাম্‌নে ঝুলাইয়া ধরিল।

অনু বিরক্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে নাকি কান্নার সুরে বলিয়া উঠিল—এ কাপড় কেন ? আমি খুদির মতন জরি-দেওয়া কাপড় আর ফেরাক নেবো।

পুঁটি বলিল—তেমন কাপড় ত বাজারে নেই অনু, সব বিক্রী হয়ে গেছে।

—না-আ, তুই যে বলেছিলি, মা দুগ্‌গা আমাকে ভালো কাপড় দেবে!

—এই ত ভালো কাপড় মা দুগ্‌গা পাঠিয়ে দিয়েছে।

—না না, মা দুগ্‌গা আমাকে ভালো কাপড় দেবে। তুই যা, নিয়ে আয়......

অনু বায়না ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। তার ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে কান্নার স্বর আর বাহির হইতে চাহিতেছিল না; কান্নায় তার শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল; তাহা দেখিয়া মলিনা আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না—ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বারান্দায় রেলিঙের উপর মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—মা, মাগো! তোমার অনুর কষ্ট যে আর দেখ্‌তে পারি না মা!

ঘর হইতে অনুরও শ্বাসকষ্টে-বাধাপ্রাপ্ত ক্ষীণ কান্না শোনা যাইতে-ছিল—আমি জরি-দেওয়া কাপড় নেব, খুদির মতন ফেরাক নেব......

তাকে সান্ত্বনা দিবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া পুঁটি নীরবে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে অনুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মলিনা মুখ তুলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এই যে মরণাপন্ন ছোট বোনটি একখানা কাপড়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছে, এর এই সামান্য অভাব পূরণ করিবার সঙ্গতিও তার নাই। এই একমাস হইল অনু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে; তার ঔষধ পথ্য ডাক্তারের খরচ জোগাই-তেছে একলা পুঁটি দুই বাড়ীতে ঠিকা ঝিয়ের কাজ করিয়া। পুঁটি তাদের কেই বা? মলিনার মা যে-বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করিত, পুঁটি ছিল সেই বাড়ীর ঝি; মলিনার মা মরিবার সময় পুঁটির হাতে দুটি নিরাশ্রয় মেয়েকে সঁপিয়া দিয়া অনুরোধ করিয়াছিল—"পুঁটি, এদের তুই দেখিস্ বোন।" পুঁটি সেই অবধি ধর্ম্মসম্পর্কে তাদের মাসী হইয়া নিজের গতর খাটাইয়া তাদের খাওয়া পরা বাসাভাড়া সব চালাইতেছে! নিজের মাসী

থাকিলেও এর চেয়ে আর কি বেশী করিত! যা দুই-একখানা ঘটী-বাটি ছিল, তাও অনুর অসুখে বেচিয়া ফেলিতে হইয়াছে। মলিনা কাজ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু পুঁটি স্বীকার করে নাই—এই সোমত্ত বয়সে পরের বাড়ীতে কাজ করিতে যাওয়া, পথে বাহির হওয়া, হইতেই পারে না; তা ছাড়া দুজনেই কাজে গেলে রোগা অনুকে দেখিবে কে? এই অল্প বয়সে মাকে হারাইয়া, উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দুর্ব্বল অনু মরিতে বসিয়াছে; তাকে বাঁচাইবার জন্য পুঁটি প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু অভাবের কষ্ট যে দিন দিন উৎকট অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ দুর্গাপূজার ষষ্ঠী; আজ ঘরে ঘরে আনন্দ উৎসব; কিন্তু তাদের ঘরে এ কী দুঃখ কঠিন হইয়া চাপিয়া বসিয়াছে! সকলের ঘরে মা আসিতেছে, তারাই দুটি বোন কি শুধু মাতৃহারা হইয়া থাকিবে?

ঘর হইতে আবার অনুর কাতর ক্রন্দন শোনা গেল—তুই মা দুগ্‌গাকে গিয়ে বল্‌গে না, অনু ভালো কাপড় চাইছে, তা হলেই মা দুগ্‌গা দেবে... আমার জন্যে মা দুগ্‌গা কাপড় রেখে দিয়েছে দিদি বলেছে......

মলিনার চোখের সাম্‌নে দপ করিয়া আলোর ফুলের মতন ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলিয়া উঠিল। তাদের ঘরের সাম্‌নের দিকের চত্বরে নীচের তলায় বড়রাস্তার ধারে এক ডাক্তারের রোগী দেখার ঘর; সেই ঘরের উপর তলায় থাকে সেই ডাক্তার। তারই ঘরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মলিনা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই উজ্জ্বল-আলোক-প্লাবিত ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল ডাক্তারের পিছনে পিছনে একজন চাকর একটা কাগজে-মোড়া বস্তা আনিয়া ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর রাখিল। ডাক্তার সেই বস্তার কাগজ খুলিয়া একে একে বাহির করিতে লাগিল শাড়ী শেমিজ ব্লাউজ পেটিকোট নানান রকমের, রেশমী, জরি-দেওয়া, দামী দামী! মলিনা সেই-সব দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিল—

একজনের আবশ্যকেরও অতিরিক্ত থাকে, আর কারো আবশ্যকই পূরণ হয় না, এমন অসামঞ্জস্য জগতে হয় কেন ?

হঠাৎ মলিনার চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে দেখিল ডাক্তারের এক হাতে একখানি ছোট বেনারসী শাড়ী আর অপর হাতে একটি সিল্কের সুন্দর ফ্রক—ডাক্তার প্রশংসার দৃষ্টিতে সে দুটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছে। এই দুটিই ত অনুর ঠিক হয়, অনু যে এম্‌নি দুটি সামান্য জিনিসের জন্য কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতেছে !

মলিনা শুনিতে পাইল পুঁটি অনুকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে—তুমি চুপ করো, আমি মা দুগ্‌গার কাছে গিয়ে বল্‌ছি।

পট করিয়া ডাক্তারের ঘরের আলো নিবিয়া গেল। মলিনা অন্ধকারে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—তার চোখের সাম্‌নে জ্বলিতেছিল তখনো সেই বেনারসী জরির শাড়ী আর সল্‌মাচুম্‌কির কাজকরা মখ্‌মলের ফ্রক ! পুঁটি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তবু মলিনা নড়িল না। পুঁটি অন্ধকারে মলিনার পাশ দিয়া বাহিরে যাইতে যাইতে মলিনাকে বলিয়া গেল—মলিনা, তুই একটু অনুর কাছে যা মা, আমি একবার দেখি কোথাও কিছু ধার-টার যদি পাই।

মলিনা তবু আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সে অনুর সাম্‌নে মিথ্যা আশ্বাস লইয়া যাইতে ভয় পাইতেছিল।

এবার আবার ডাক্তারের নীচের ঘরে আলো জ্বলিল, ডাক্তার ও তার চাকর দুজনেই নীচের ঘরে।

মলিনার চোখ দুটা অকস্মাৎ কিসের সুযোগ দেখিতে পাইয়া অন্ধকারে জ্বলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি অন্ধকারে উঠানের দিকে নামিয়া গেল।

সেই বাড়ীর বাহিরের অংশ ও ভিতরের অংশের মাঝখানে একটা

কপাট বন্ধ থাকিত। মলিনা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। মলিনা একবার এদিক ওদিক চাহিল, একটু ইতস্ততঃ করিল, তার পর বন্ধ দরজার বুক চাপিয়া যে হুড়্‌কা লাগানো ছিল তাতে হাত দিল। মলিনা কপাটের খিল ধরিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল সেই অন্ধকারের মধ্যে। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল তাদেরই বাড়ীর অপর ভাড়াটে খুদির মা জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি রে অনু, তুই একলা আছিস? তোর দিদি মাসী কোথায় গেল?... ..মা দুগ্‌গার কাছ থেকে ভালো কাপড় আন্‌তে গেছে?......

অনুর ক্ষীণ কণ্ঠ মলিনা শুনিতে না পাইলেও তার প্রতিধ্বনি খুদির মার কথায় মলিনা শুনিতে পাইল—তার দিদি মাসী মা-দুগ্‌গার কাছ থেকে ভালো কাপড় আনিতে গিয়াছে! মলিনার বুকের মধ্যেটায় কঠিন বেদনা মোচড় দিয়া উঠিল। সে আস্তে আস্তে বন্ধ কপাটের খিল খুলিয়া ফেলিল। তার অদৃষ্টের দরজার মতন সেই কপাট আস্তে আস্তে তার হাতের টানে খুলিয়া গেল, দরজার ওপিঠে কোনো বন্ধনই ছিল না। সেই খোলা দরজার সাম্‌নে মলিনা দাঁড়াইয়া তার অন্ধকার জঠরের মধ্যে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিল, একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, তার পর ক্ষিপ্রপদে সেই চৌকাঠ পার হইয়া পিছনে খোলা দরজা ভেজাইয়া দিল।

যখন যখন ঐ বাহিরের দিকটায় ভাড়াটে না থাকে তখন বাড়ীর ভিতরের ভাড়াটেরা ঐ মহলে যাতায়াত করিয়া থাকে। মলিনারাই এ বাড়ীর সবচেয়ে পুরানো ভাড়াটে; তাই এ বাড়ীর সমস্ত অলি-গলি পথ সিঁড়ি মলিনার পরিচিত, অভ্যস্ত। সে লঘু নিঃশব্দ পদে সিঁড়ি দিয়া উপরের ঘরে গেল; আন্দাজে আন্দাজে ঘরের মাঝখানে যে টেবিলের উপর জামা কাপড় ছড়ানো ছিল তারই উপর হাত দিয়া দিয়া

সে সেই কিছুক্ষণ-আগের-দেখা ছোট্ট কাপড়খানি ও ফ্রকটি বাছিয়া তুলিয়া লইল।

মলিনা কাপড় জামা তুলিয়া লইয়া নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির মাথায় আসিয়াছে, এমন সময় নীচে হইতে ডাক্তারের চাকর প্রশ্ন করিল—কে ?

ভেলার আঠার মতন ঘন কালো এই অন্ধকারের ঐ একটি শব্দে মলিনার বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, তার মুখ একেবারে শুকাইয়া রক্ত-হীন বিবর্ণ হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি সে কাপড় জামা কাপড়ের তলে লুকাইয়া ফেলিতে লাগিল।

কিন্তু সেই প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গেই বেহারার একটি আঙুলের টিপনে কট করিয়া সিঁড়ির উপরকার বিদ্যুতের আলো চোখ মেলিয়া চাহিল। আলোর সেই বিস্ময় ও বিদ্রূপভরা দৃষ্টির সম্মুখে ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইয়া মলিনা থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

বেহারা চীৎকার করিয়া উঠিল—বাবু, চোর চোর !

ডাক্তার সনৎ পাশের ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কৈ রে ?

বেহারা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল—ঐ যে !

সনৎ সিঁড়ির তলা হইতে উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল সিঁড়ির প্রথম ধাপে লজ্জায় ভয়ে কাতর হইয়া আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া আছে একটি উজ্জ্বলগৌরবর্ণা রূপসী তরুণী—বয়স তার সতেরো আঠারো বড় জোর; মুখখানি তার দুঃখের ছায়ায় সুন্দরতর, আধখানি চাঁদের মতন তার কপালের উপর এলোথেলো চুল ছড়াইয়া পড়িয়াছে! এই চোর ? এমন সুন্দর !

সনৎ প্রসংশমান দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া মলিনা অতি কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া পরিত্রাণের মিথ্যা আশায় বলিল—আমার বোনের বড় শক্ত অসুখ, তাই ডাক্তার-বাবুকে ......

বেহারা বাধা দিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না বাবু, ও কাপড় জামা চুরি কোরে কাপড়ের তলায় লুকিয়েছে, আমি দেখেছি।

মলিনার ঠোঁট দুখানি বাতাসে ফুলের ঝরন্ত পাপ্‌ড়ির মতন একটু শুধু কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা হইতে একটুও শব্দ বাহির হইল না।

সনৎ বেহারাকে ধমক দিয়া বলিল—তুই চুপ কর্ গাধা!

তার পর মলিনাকে বলিল—কোথায় তোমার বাড়ী? চলো তোমার বোনকে দেখে আসি।

বেহারা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল—বাবু, ও মিথ্যা কথা বল্‌ছে। আমি ওর কাপড়ের ভিতর থেকে জামা কাপড় বার কর্‌ছি দেখুন। নয়তো আপনি পরে বল্‌বেন আমিই চুরি করেছি।

বেহারা সিঁড়িতে উঠিতে যাইতেছিল, সনৎ তাকে ধরিয়া পিছনে সরাইয়া দিয়া মলিনাকে বলিল—তুমি বাড়ী যাও। যদি দর্‌কার হয় আমাকে তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও, আমি তোমার বোনকে দেখ্‌তে যাব।

বেহারা বলিয়া উঠিল—ও ত এই ভিতর-বাড়ীর নীচের ঘরের ভাড়াটে, ওর বোন ব্যারাম আছে বটে অনেক দিন, কিন্তু ও সেজন্যে আসেনি ......

সনৎ এক ধাক্কা দিয়া বেহারাকে সেখান হইতে সরাইয়া দিয়া আবার মলিনাকে বলিল—তুমি বাড়ী যাও।

সনৎ বিস্মিত দৃষ্টিতে মলিনার দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—এমন সুন্দরী এই পচা বাড়ীটার মধ্যে লুকাইয়া ছিল, এত দিন একবারও তার চোখে পড়ে নাই!

মলিনা এতক্ষণ যতরকম অপমান ও লাঞ্ছনার ভয় করিতেছিল, এই আশাতীত ভদ্রতা তার কাছে সে-সবের চেয়েও কঠিন অসহ্য বোধ

হইল। তার শিথিল হাত হইতে চুরি-করা কাপড় জামা খসিয়া তার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—রোগা বোনের কান্না দেখে না থাক্‌তে পেরে আমি চুরি কর্‌তেই এসেছিলাম।

সনৎ সিঁড়ির উপরে উঠিয়া আসিয়া মলিনার পায়ের উপর হইতে জামা কাপড় তুলিয়া লইয়া বলিল—আমাকে তুমি তোমার বাড়ীতে নিয়ে চলো, আমি তোমার বোনকে এই জামা কাপড় দিয়ে দেখে আসি।

মলিনা বিস্ময়ে সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় স্তব্ধ হইয়া সনতের মুখের দিকে চাহিল, মলিনার দুই চোখ দিয়া বেদনার নদী জোয়ারে উচ্ছ্বসিত হইয়া ছুটিয়া বহিতেছিল।

সনৎ একটু ইতস্ততঃ করিয়া ছোট বোনের দুঃখে কাতর দাদার মতন মলিনার পিঠে পরম সান্ত্বনা ও ভরসার আশ্রয় নিজের হাতখানি রাখিয়া বলিল—বাড়ী চলো।

মলিনা সনতের আকর্ষণে যন্ত্রচালিত পুতুলের মতন ধীরে ধীরে অবশ পা তুলিয়া আবার নিজের ঘরের সাম্‌নে ফিরিয়া আসিল।

ঘরের সাম্‌নে আসিয়াই দেখিল খুদির মা অনুর মুখের কাছে ঝুঁকিয়া দাড়াইয়া আছে। মলিনা দরজার সাম্‌নে আসিতেই খুদির মা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া বলিয়া উঠিল—কোথায় গিছ্‌লি লা রাত-বেড়ানী ছুঁড়ি! এই কি তোর রঙ্গ কর্‌তে যাবার সময় লা! এদিকে বোন যে হয়ে গেল!

এই রূঢ় বাক্যের মধ্যে মলিনার কানে রূঢ়তম হইয়া বাজিল—বোন যে হয়ে গেল!

মলিনা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া একবার খুদির মার মুখের দিকে চাহিল। তারপর উচ্ছ্বসিত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল—না, না, মিথ্যে কথা!

খুদির মা ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—ওলো ঠাটকাঁদুনী, দেখ্‌গে যা সত্যি কি মিথ্যে।

মলিনা ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া গিয়া অনুর মুখের কাছে বসিয়া পড়িয়া কাতর স্বরে ডাকিল—অনু, অনু, অনু ভাই!

অনুর শিশু-মুখখানি একটি মিষ্ট হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া আছে, তার বড় বড় চোখ দুটি অর্দ্ধমুদ্রিত।

মলিনা দুই হাতে অনুর মুখ ধরিয়া সমস্ত প্রাণের ব্যাকুলতা ঢালিয়া ডাকিল—ভাই অনু, তোর জন্যে যে আমি চুরি করতে গিয়েছিলাম ভাই, তোর জন্য মা দুগ্‌গা যে জামা কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন! তুই একবার ভাখ্‌, একটিবার,.....ওরে অনু......

মলিনা দুই হাতে অনুকে নাড়া দিতে দিতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া এইবার ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহির হইতে পুঁটির গলা শোনা গেল—আর কাঁদিস্‌নে মা মলিনা, ভাখ্‌ কেমন কাপড় এনেছি অনুর জন্যে।

মলিনা সেই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো মাসী, অনু যে আমাদের ওপর রাগ কোরে আপনিই মা দুগ্‌গার কাছে জামা কাপড় নিতে গেল!

পুঁটি সেই অন্ধকারে উঠানের মাঝেই আছাড় খাইয়া পড়িল—অনু রে! আর একটু স্বর সইল না মা—শেষ-দেখাটাও দেখ্‌তে দিলিনে।......

সনৎ মাথা নত করিয়া দরজার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া এই দারুণ শোকের বেদনায় বিদ্ধ হইতেছিল। ডাক্তার সে, অনেক মৃত্যু সে দেখিয়াছে, তবু তার হৃদয় এখনো কঠিন হয় নাই। বয়স তার তরুণ, মোটে সাতাশ-আটাশ, সংসারের দুঃখের সঙ্গে পরিচয় তার অল্প,

তাই তার মন এখনো বড় কোমল আছে। সে এই করুণ শোকের আঘাত নিজের অন্তরেও অনুভব করিতেছিল। সে খুব জোরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুঁটির কাছে গিয়া বলিল—আর কেঁদে কি হবে, রাত হচ্ছে; নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর্‌তে হয় এখন।

পুঁটি মুখ তুলিয়া সনৎকে চিনিতে পারিয়া তার পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল, দুই হাতে সনতের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ডাক্তার-বাবু, আমার অনুকে বাঁচিয়ে দাও, সে যে ভালো কাপড়ের জন্যে বড় ব্যস্ত হয়েছিল......

সনৎ পা ছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া চোখের কোলের ছলছল জল মুছিয়া ফেলিল, তার পর সে খুদির মার কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিল—আপনি একটু দেখুন এদের, নইলে এদের ত এখন কিছু কর্‌বার শক্তি নেই।

খুদির মা মাথায় ঘোমটা টানিয়া গিয়া পুঁটিকে তুলিল। খুদির মা ও পুঁটির পিছনে পিছনে সনৎ ঘরে গিয়া মৃদু স্বরে বলিল—মলিনা, এই জামা কাপড় অনুকে পরিয়ে দাও। আমি আমার বেহারাকে খাট আন্‌তে আর লোক ডাক্‌তে পাঠাচ্ছি।

সনতের দেওয়া বেনারসী কাপড় ও সিল্কের জামা পরিয়া, পুঁটির অনেক দুঃখে সংগ্রহ করিয়া আনা জরির ডুরে কাপড়খানি গায়ে ঢাকা দিয়া, অনু মা-দুর্গার কাছে যাত্রা করিল—তখন পাশের বাড়ীতে বোধন-আরতির কাঁসর-ঘণ্টা ঢাক-ঢোল মহা সমারোহে বাজিতেছে।

সনৎ পুঁটির হাতে দশটি টাকা দিয়া বলিল—আমাকে আজই বাড়ী যেতে হচ্ছে। পূজোর পরই আমি ফিরে আস্‌ব।

সনৎ একবার ভূলুণ্ঠিতা লতার মতন মলিনার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

২)

পূজার পর সনৎ কলিকাতায় ফিরিয়াই মলিনাদের বাড়ীর উঠানে আসিয়া ডাকিল—পুঁটি-মাসী।

মলিনা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া একবার সনতের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল—মাসী বাড়ীতে নেই, কাজে গেছে।

সনৎ ফিরিয়া যাইবে কি থাকিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। মলিনা মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া আঁচলের খুঁট পাকাইতে লাগিল। মলিনা কোনো পুরুষের সাম্‌নে বাহির হয় না, কথাও কয় না। কিন্তু যার সাম্‌নে সে একদিন চুরির লজ্জা মাথায় করিয়া মুখ দেখাইতে বাধ্য হইয়াছে, যার সঙ্গে সে কথা কহিয়াছে, যে সহানুভূতিতে বন্ধু, মমতায় আত্মীয়, যার কাছে তারা কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ, তার নিকট হইতে লুকাইয়া থাকিতে মলিনা পারে নাই। মলিনা সনতের চলিয়া যাওয়ার অপেক্ষায় চুপ করিয়া মাটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সনৎ যাইবার জন্য ফিরিতে গিয়াও না ফিরিয়া মলিনার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি তোমাকেই একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম।

মলিনা মুখ না তুলিয়াই বলিল—কি বলুন।

সনৎ একটু ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—আমি ভাব্‌ছিলাম, একা পুঁটির রোজ্‌কারে ত ভদ্রঘরের মেয়ের চল্‌তে পারে না......

মলিনা নত মুখে মৃদু স্বরে বলিল—মাসী আমায় কাজ কর্‌তে দিতে চায় না।

—আমি তাকে বুঝিয়ে বলব; তোমরা দুজনে কাজ কর্‌লে তবু কতকটা......

—মাসী যেখানে কাজ করে সেখানেই আমার কাজ না হলে কিছুতেই ও অন্য জায়গায় যেতে দেবে না।

—তেমন বাড়ী কি কল্‌কাতায় পাওয়া যায় না যেখানে তোমাদের দুজনেরই কাজ হয় ?

—মাসী যে-বাড়ীতে কাজ করে সেখানকার বাবুরা একজন রাঁধুনী খুঁজ্‌ছে, কিন্তু বাবুরা মাতাল, ভালো লোক নয় বোলে মাসীর মত নয়।

এই কথা বলিতে বলিতে শ্বেতপদ্মকলির মতন মলিনার মুখখানি লজ্জায় রক্তপদ্মের মতন হইয়া উঠিল।

তাহা দেখিয়া সনৎও একটু লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া বলিল—আচ্ছা, যে মাতাল নয়, যাকে তার বন্ধু আত্মীয় পর সবাই ভালো না হোক খুব খারাপ লোক মনে করে না, এমন ভদ্রলোকের বাড়ীতে যদি তোমাদের দুজনেরই কাজ কর্‌বার সুবিধা আমি কোরে দিতে পারি ...... ?

এই প্রশ্নের মধ্যে কি ছিল জানি না, কিন্তু সনৎ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল এবং মলিনা অত্যন্ত বেশীরকম মাথা হেঁট করিয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা করিয়া তুলিয়া কোনোরকমে উচ্চারণ করিল—পুঁটি-মাসীকে বল্‌ব।

সনৎ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। মলিনা মুখ তুলিয়া নিজের ঘরের দিকে ফিরিতেই দেখিল খুদির মা সিঁড়ির মাঝ-চাতালে দাঁড়াইয়া তার দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে। মলিনা তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের অন্ধকার জঠরে গিয়া লুকাইল।

সনতের বাড়ী শাল্‌খেতে। পসারের সুবিধা হইবে বলিয়া সে কলিকাতায় ঘর ভাড়া লইয়া আছে—নীচের ঘরটিতে সে "সমাগত দরিদ্র রোগীদিগকে বিনা দক্ষিণায় দেখিয়া থাকে," এবং উপরের ঘরটায়

তার আহার ও বিশ্রাম হয়। সকালে উঠিয়া সে কলিকাতায় আসে, রাত্রি নটা-দশটার পর সে শালখের বাড়ীতে ফিরিয়া যায়। সুতরাং কলিকাতার বাসাটাই তার প্রধান আড্ডা, আসল বাড়ীটা রাত্রিবাসের নীড় মাত্র। তাও আবার মাঝে মাঝে শক্ত রোগী হাতে থাকিলে কলিকাতার বাসাতেই রাত্রি যাপনও করিতে হয়। এতদিন সে ইক্‌মিক্‌-কুকারে বা ষ্টোভে নিজে রাঁধিয়া, অথবা তার চাকর রাঘবের অপূর্ব্ব রান্না অথবা হোটেলের খাবার খাইয়া দিন চালাইয়া আসিয়াছে। এখন আর তার এত কষ্ট করা ভালো লাগিতেছিল না। একজন ভালো রাঁধুনী রাখিতেই ত হইবে, তা যদি মলিনাকে সেইসঙ্গে সাহায্য করাও হয় ত মন্দ কি। আহা ভদ্রলোকের মেয়ে! নইলে এমন চেহারা!

পুঁটি মলিনার কাছে সনতের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জোর দিয়া বলিল—নাঃ, তোমার আর কাজ করতে হবে না। আর আমাদের খরচ কি? অনু আমাদের খরচ বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।

মলিনার চোখ দিয়া টশটশ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে আর কোনো কথা বলিল না।

পাঁচ-সাত দিন গেল, সনৎ মলিনার কোনো উত্তরই পাইল না। রোজই সে দেখে পুঁটি বাহিরে যায়, বাড়ীতে আসে, কিন্তু তাকে পুঁটি কিছুই বলে না। সনৎও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।—উপকার করিবার আগ্রহটা যদি দাতার দিকেই প্রবল হইয়া উঠে তবে লোকে দাতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেও ত পারে।

সুতরাং সনৎ রাঁধুনী ও ঝি রাখার সঙ্কল্প এক-রকম ত্যাগ করিয়া আবার কুকারের রান্নাতেই তৃপ্তি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। হঠাৎ একদিন পুঁটি আসিয়া তার ঘরে ঢুকিল।

বাড়ীওয়ালা ঘরের ভাড়া বাড়াইয়াছে; হয় পুঁটি ও মলিনাকে

উঠিয়া খোলার ঘরে যাইতে হইবে, নয় ত মলিনাকেও চাকরী স্বীকার করিতে হইবে। খোলার ঘরে দশ ঘর ছোটলোকের সঙ্গে মলিনাকে রাখা সঙ্গত নয়, তার চেয়ে তার পাহারায় মলিনার কোথাও চাকরী লওয়া ভালো। সনৎ-ডাক্তারের বাড়ীতে কোনো মেয়েলোক নাই যদিও, তবু তার বাসা মলিনার বাসার লাগাও, পুঁটি সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিবে, যতদূর খোঁজ লওয়া সম্ভব তাতে জানা গিয়াছে সনৎ সচ্চরিত্র সাধু ভদ্রলোক, অতএব চাকরী যদি মলিনাকে করিতেই হয় তবে এই বিপদ-দিনের বন্ধুর কাছেই করা উচিত। এইরকম সাত-পাঁচ-রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া পুঁটি সনৎকে বলিতে আসিয়াছিল সনৎ নিজে যদি মলিনাকে ও পুঁটিকে চাকরী ছায় তবে তারা করিতে প্রস্তুত আছে।

সেই দিন হইতে মলিনা সনতের বাসায় রাঁধুনীর কাজে ভর্ত্তি হইল।

সনতের থাইবার ঠাঁই করিয়া দিয়া পুঁটি ডাকিল—মনু, ভাত নিয়ে আয় মা।

সনৎ সেই ডাকে হঠাৎ কেন উচ্চকিত হইয়া উঠিল।

আজ দিনের স্পষ্ট আলোকে সনৎ দেখিল মলিনার পরনে একখানি শতছিন্ন কাপড় শুধু শেলাইএ আস্ত হইয়া আছে; তাই পরিয়া অসম্বৃত পরিপূর্ণ যৌবনের লজ্জায় জড়সড় হইয়া তুই হাতে ভাতের থালা ধরিয়া মলিনা মূর্ত্তিমতী সেবার মতন সিঁড়িতে উঠিতেছে। সিঁড়ির ধাপে ধাপে ফুটফুটে ছোট ছোট পা তুখানি পড়িতেছিল লক্ষ্মীপূজার আল্পনার মতন। মলিনা যখন ভাতের থালা লইয়া উপরে উঠিল তখন সনতের চোখ তার ডাক্তারী বইয়ের মধ্যে অস্থিবিদ্যা ও শরীরতত্ত্বে নিমগ্ন থাকিলেও তার মন সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের সন্ধান করিতে ব্যস্ত ছিল,—ঘরে যে শরীরিণী শ্রীর আবির্ভাব

হইয়াছে সেদিকে প্রবল আকর্ষণ চোখ দুটাও অনুভব করিতেছিল, তবু তাদের কঙ্কালের বিকট ছবিতেই আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছিল, কারণ পুঁটি তখন চোখ পাকাইয়া ডাক্তার-বাবু ও মনুর ব্যবহারের উপর পাহারা দিয়া দাড়াইয়া আছে। মলিনা ভাতের থালা রাখিয়া চলিয়া গেল, তবু সনৎ যেন টেরই পায় নাই এমনি ভাবে পাঠে নিমগ্ন। পুঁটি ডাকিল—বাবু, ভাত দেওয়া হয়েছে।

সনৎ বই মুড়িয়া আসনে আসিয়া বসিল। পুঁটি নীচে গিয়া মলিনার কাছে যেন আপন মনেই বলিয়া ফেলিল—বাবু বড় ভালো লোক, কারো পানে উঁচু নজরে চায় না পর্য্যন্ত।

মলিনা সঙ্কুচিত হইয়া রান্নাঘরের অন্ধকার কোণে গিয়া লুকাইল।

সনৎ আজ অন্নপূর্ণার রন্ধনের স্বাদ বহুকাল পরে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া গেল। নির্ম্মল থালা-বাটিতে ভাত-তরকারীর পরিপাটী সজ্জার মধ্যে মলিনার সুন্দর হাতের নিপুণ সেবার স্পষ্ট পরিচয় সে অনুভব করিতে লাগিল। সে তৃপ্ত হইয়া মেডিক্যাল কলেজে চাক্‌রীর জন্য বাহির হইয়া গেল।

বিকালে সে বাড়ী ফিরিয়াই দেখিল কোন্ যাদুকরীর করস্পর্শে তার সেই চিরকালের বকেয়া ঘরের চেহারা একেবারে বদল হইয়া গেছে। টেবিলটি বোধহয় স্নান করিয়া তার ধূসর চেহারা হারাইয়া বার্ণিশের জলুসে হাসিতেছে; তার উপরকার এলোমেলো বই খাতা ঔষধের শিশি পিচ্‌কারী ষ্টেথিস্কোপ সোলাহ্যাট নেকটাই প্রভৃতিও শৃঙ্খলায় নানা বিভাগে বদ্‌লী হইয়া গিয়াছে—বই খাতা গিয়াছে শেল্‌ফে, ওষুধ-বিষুধগুলা গিয়াছে তাকে, হ্যাট নেকটাই মোজা জামা গিয়াছে পরিপাটী পাট হইয়া আল্‌নায়।

বিকালের জলখাবার লইয়া আবার মলিনা আসিল, সঙ্গে পাহারা

পুঁটি। সনৎ দেখিল আজকের জলখাবার নিত্যকার মতনই গজা শিঙ্গাড়া কচুরী, কিন্তু বাজারের নয়—বাজারের মতন গঠনে তেমন নিখুঁৎ না হইলেও ভেজালশূন্য, আন্তরিকতা ও যত্নের পূর দেওয়া উপাদেয় জিনিস।

সনৎ রাত্রে আহার করিয়া বাড়ী চলিয়া গেল, কিন্তু ঔৎসুক্য বহিয়া চলিল কখন আবার সে এই নীড়টিতে ফিরিয়া আসিবে। যে বাসা তার শূন্য আকর্ষণহীন ছিল. তাহা হঠাৎ মমতায় ভরাট হইয়া উঠিয়াছে।

সনৎ প্রতিদিনের আহারের ও জলখাবারের সময় দেখে কাল যে জিনিস খাইয়াছে আজ তার সন্ধান নাই, আজ সেইসব উপকরণই যাদুকরীর হাতের গুণে ভোল ফিরাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সনৎ কাঁচকলার কোপ্তা খাইয়া বলে মাংসের কোপ্তাটা খাসা হইয়াছে, থোড়ের ডান্‌লা খাইয়া বলে ওলকপির কালিয়াটা তোফা হইয়াছে। রন্ধনকারিণী এই পুরস্কার পাইয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া শুধু একটু হাসে।

কিন্তু আহার যত পরিপাটী হইতেছিল সনতের তত ভয় হইতেছিল খরচটা পাছে আয় ছাড়াইয়া উপ্‌চাইয়া যায়। তার উপর তার বেহারা রাঘব অত্যন্ত ঘ্যান-ঘ্যান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল—বাবুর যেমন আক্কেল, এনে জোটালে কিনা এক চোরকে! একেবারে ফতুর কোরে ছাড়্‌বে। বেশী খরচ হলে কি চুরি গেলে আমি জানিনে কিন্তু—আমি আগে থাক্‌তে বোলে রাখ্‌ছি।

সনৎ পুঁটিকে ডাকিয়া বলিল—আমি ত সর্ব্বদা বাইরে-বাইরেই ঘুরে বেড়াই, কখন্ কি খরচের দর্‌কার হয় তার ত ঠিক নেই, খরচের টাকাটা নলিনার কাছেই থাকুক। আমরা চার জন, জনা-পিছু পাঁচ টাকা কোরে খরচ ধর্‌লে হয় কুড়ি টাকা, আর আমাদের জলখাবারের ধরো পাঁচ টাকা—এই পঁচিশ টাকা রেখে দাও। দু-চার টাকা বেশী লাগে পরে দেবো, কিন্তু যত অল্প খরচ হয় তার দিকে নজর রাখ্‌তে বোলো।

পুঁটি নীরবে কথা কয়টা শুনিয়া টাকা কয়টা লইয়া চলিয়া গেল।

সনৎ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল খরচের বরাদ্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আহারের বরাদ্দ কিছু মাত্র কম হইল না এবং রাঘবের ঘ্যান্‌ঘ্যানানিরও অন্ত নাই।

পুঁটি এতদিন দুঃখীর সংসার চালাইয়া আসিয়াছে, সে জানে কোন্ জিনিস কোথায় সস্তা, কি দরে বিকায়। তার হুকুমেই এখন রাঘবকে চলিতে হয়, একটা পয়সা এদিক-ওদিক করিলেই পুঁটি আগুন হইয়া উঠে; মলিনাও অনুযোগ করিয়া তার স্বভাবমধুর মৃদুস্বরে বলে - ছি রাঘব, অন্নদাতা মুনিবের পয়সা কি না জানিয়ে নিতে আছে?

ক্রমে রাঘব-সুদ্ধ বশ মানিয়া গেল বলিয়াই হোক, অথবা তার নালিশ সনতের অভ্যাস হইয়া যাওয়াতেই হোক, সনৎ দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া পরম আরামে নিত্য নূতন উপাদেয় আহারে দেহ ও মনে তৃপ্তি পাইতে লাগিল। মলিনার হাতের সেবা পাইবার লোভে সে যতক্ষণ বাসায় থাকে ততক্ষণ শুধু জিনিস-পত্তর এলোমেলো হেলাগোছা করিয়াই বেড়ায়, তার পর একবার বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়াই দেখে সব ফিটফাট হইয়া গেছে।

এক বাড়ীতেই সনৎ ও মলিনা থাকে, কিন্তু সনৎ মলিনাকে দেখিতে পায় অল্পই, কথা বলিবার সুযোগ ঘটে আরো অল্প, কারণ উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা উপস্থিত আছে পুঁটি। যা কিছু আদেশ তা সে-ই শোনে, কখন্ যে কে পালন করে তা সনৎ জানিতেও পারে না—কেবল চারটি বার খাবার দিতে মলিনা সনতের সম্মুখে আসে। সনৎ আগে সমস্ত দিন বাহিরে-বাহিরেই বেড়াইত; এখন কিন্তু সে বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া বাসায় আসে, এবং এমন অসময়ে হঠাৎ আসে যে মলিনা প্রায়ই তার সাম্‌নে পড়িয়া যায়। একবার পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া দুজনেরই

মুখ উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, তার পরক্ষণেই তারা লজ্জায় লাল হয় এবং দুজনেই চোখ নামাইয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া যায়।

মাসের শেষের দিকে সনৎ জিজ্ঞাসা করিল—খরচের টাকা আছে, না চাই আরো?

পুঁটি বলিল—আছে এখনো।

মাসকাবারে সনৎ আবার যখন পুঁটিকে টাকা লইতে ডাকিল, তখন পুঁটি সনতের সামনে আনিয়া রাখিল একখানা জমাখরচের খাতা—তাতে সুন্দর মেয়েলি লেখায় রোজকার খরচ টোকা আছে। জমা পঁচিশ টাকা, খরচ একুশ টাকা সাড়ে এগারো আনা, "হস্তে স্থিত" তিন টাকা সাড়ে চার আনা!

সনৎ উৎফুল্ল দৃষ্টিতে জমাখরচের লেখার ছাঁদ দেখিতে দেখিতে বলিল—এ কার লেখা?

—মলিনার।

—মলিনা লেখাপড়া জানে!

—ছেলেবেলা স্কুলে পড়েছিল বছর কতক।

—এত অল্প খরচে এমন চমৎকার খাওয়া কেমন কোরে হল?

রাঘব ঝাঁজিয়া বলিয়া উঠিল—হবে না কেন, ঝি-মা খায় আপনার পাতের কুড়োনো-বাড়ানো, আর বামুন-দিদি খায় কোনো দিন নুন ভাত, কোনো দিন তেঁতুল-পোড়া ভাত!

সনৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আর তুমি কি খেতে পাও রাঘব—কলা-পোড়া?

রাঘব মুখ নিটোল করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—না বাবু, তা মিথ্যে কথা কইলে ধর্ম্মে সইবে কেন—আপনি যা খান আমিও তাই খাই। আমাদের খাইয়ে যদি কিছু বাঁচে ত ওনারা খান, নয় ত ঐ যা বল্লাম আর কি!

সনৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হইয়া বলিল—অমন কোরে আমার টাকা বাঁচাতে হবে না পুঁটি-মাসী।

সনৎ মলিনার দেখাদেখি পুঁটিকে আজ মাসী বলিয়াই ডাকিল, ঐ নিঃস্বার্থ মহৎপ্রাণ রমণীকে দরিদ্র ও দাসী বলিয়া সে কখনো সামান্য মনে করিতে পারে নাই, সে তাকে মনে মনে সম্মান করে, শ্রদ্ধা করে, ভয়ও করে। আজ সে শ্রদ্ধা আরো বাড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

পুঁটি সনতের কথা শুনিয়া শুধু একটু হাসিল।

সনৎ মাস-খরচের জন্য এমাসেও পঁচিশ টাকা দিল, উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত লইল না। তারপর মলিনার মাইনে ছয় টাকা ও পুঁটির বেতন চার টাকা পুঁটির হাতে দিয়া সনৎ বলিল—পুঁটি-মাসী, এই তোমাদের ঘরভাড়ার টাকা।

পুঁটি ও আড়াল হইতে মলিনা সনতের কথা শুনিয়া খুসী হইল; সনৎ তাদের দাসীর মতন যে বেতন দিল না, আত্মীয়ের মতন যেন খাওয়া পরা থাকার খরচ জোগাইতেছে মাত্র, এতে তারা আরাম অনুভব করিল।

(৩)

একদিন বিকালে সনৎ মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাসায় আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। মলিনা জলখাবার লইয়া ঘরে আসিল, সঙ্গে-সঙ্গে পুঁটি। পুঁটি আসন পাতিতে যাইতেছিল, সনৎ বিছানার উপর কনুইএর ভর রাখিয়া একটু কাত হইয়া উঠিয়া বলিল—আর আসনে কাজ নেই, খাবারটা আমার হাতে দাও।

মলিনার মুখ তখনি রাঙা হইয়া উঠিল, তার দৃষ্টি লজ্জায় কোমল হইয়া পড়িল, সে একবার চকিতে সনৎকে দেখিয়া লইয়া খাবারের রেকাবিখানি আনিয়া সনতের সামনে ধরিল।

সনৎ একেবারে নিজের অত কাছে মলিনাকে অনুভব করিয়া হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া-বসিয়া চোখ তুলিয়া চাহিল ; মলিনার নত দৃষ্টি মলিনাকে বড় প্রতারণা করিল, সনতের দৃষ্টির সঙ্গে মিলনের ভয়ে সে দৃষ্টি নত করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সনতের ঊর্দ্ধ দৃষ্টির সঙ্গে তার নত দৃষ্টির বড় ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়া গেল। সনতের সৌন্দর্য্যদর্শনতৃপ্ত দৃষ্টি ঈষৎ হাসিয়া উঠিল। মলিনার বড় বিপদ ঘটিল, সে সনতের ঊর্দ্ধপ্রেরিত দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টিকে না মিলাইবার জন্য যত দৃষ্টি নত করে তবুও সেই দৃষ্টির মিলন ভাঙে না।

সনৎ অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারী শিবের মতন তার হাত পাতিল, মলিনা আস্তে আস্তে সেই খাবার-ভরা রেকাবিখানি তার হাতের উপর রাখিয়া দিল—সনতের হাতে মলিনার সুন্দর লতানো আঙুলের একটি সূচলো ডগা ঈষৎ একটু মৃদুস্পর্শ বুলাইয়া সরিয়া গেল। সনতের সমস্ত অন্তর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তার আভা সনতের মুখে চোখে পূর্ব্বগগনে অরুণোদয়ের আভাসের মতন ঊষার স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ফুটিয়া উঠিল। মলিনা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া আস্তে আস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল। সনতের দৃষ্টিকেও সে সঙ্গে সঙ্গে টানিয়া লইয়াই গেল। এত বড় ব্যাপারটা এমন সহসা ও অল্পক্ষণে ঘটিয়া গেল যে পুঁটির শ্যেনদৃষ্টির পাহারাও এখানে ঠকিয়া গেল।

সনৎ তার হাতে আজ যে মিষ্ট পাইয়াছে তাতেই তার দেহ ও মনের ক্ষুধা পরিতৃপ্তিতে শান্ত হইয়া আসিতেছিল—কোন্ মিষ্ট স্বাদুতর এ সন্দেহের অবকাশ ছিল না বলিয়াই যেন সনৎ হাতে থালা ধরিয়া বসিয়াই রহিল, মিষ্টান্ন চাখিয়া দেখিবার তার যেন আগ্রহই নাই।

হঠাৎ সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া সনতের চমক ভাঙিল ; সে মলিনার চলিয়া-যাওয়ার পথের দিকেই চাহিয়া বসিয়া ছিল, দেখিল সিঁড়িতে

উঠিতেছে তার সহপাঠী পরিতোষ। সনৎ পরিতোষকে মোটেই পছন্দ করিত না ; পরিতোষের চেহারার মধ্যে ও চালচলনে এমন একটা প্রাকৃত লোকের ছাপ ছিল যে তাকে কিছুতেই ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত না। তার পিছনের চুল চাম্‌ড়া ঘেঁষিয়া কাটা, আর সাম্‌নের চুল আধ-হাত লম্বা ; খুব করিয়া তেল মাথাইয়া কপালের উপর পেটে পাড়িয়া নানা আবর্তে তার কেশরচনার একটি কুশ্রী ভঙ্গী ছিল ; সে শক্ত ইস্ত্রি-করা শার্ট পরিয়া তার উপর একটি কালো আল্‌পাকার কোট পরিত এবং শার্টের ঝুলটা খুব পাতলা মিহি কাঁপড়ের তলে স্ত্রীলোকের শেমিজ পরার ন্যায় তার আব্রু রক্ষা করিত। সে পান চুরুট হরদম খায়, অনর্গল কথা বলে, এবং তার কথার মধ্যে দুটি বিশেষত্ব শ্রোতার কানে বাজে—সে য় উচ্চারণ করিতে পারে না, 'বায়ু'কে বলে 'বাউ', 'পয়সা'কে বলে 'পঅসা' এবং তার বর্ণমালায় মাত্র এক দন্ত্য স ছাড়া শ ও ষ ছিল না। কথা বলিবার সময় সে শ্রোতার গা ঠেলিয়া তার কথা শোনাইবার জন্য শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে। সে "দুর্মুখ" কাগজের সম্পাদক ; ভদ্রলোক ও বিশেষ করিয়া ভদ্রমহিলাদিগকে কুৎসিত ভাষায় নিন্দা ও গালাগালি করাই তার ব্যবসায়—তার মুখে ও কলমে কোনো কথাই প্রকাশ পাইতে সঙ্কোচ বোধ করে না। এইসব কারণে তাকে দেখিলেই সনৎ বিরক্ত হইত। কিন্তু পরিতোষের কতকগুলি জিনিসের উপর বিশেষ লোভ ছিল, তার একটি হইতেছে ধনী লোককে দোহন করিয়া নগদ না হোক ত অন্তত পরিপাটী আহারটা আদায় করা। সেই জন্য পরিতোষ নূতন পসার-ওলা ডাক্তার সনৎকে পাইয়া বসিয়াছিল একসঙ্গে আই-এসসি পড়িয়াছিল এই বহু পুরাতন দাবীতে।

পরিতোষ ঘরে ঢুকিয়াই বিনা ভূমিকায় সনতের হাত হইতে খাবারের রেকাবিটা তুলিয়া লইল, এবং এক হাতে রেকাবি ধরিয়া অপর হাতে এক-

খানা মাছের কচুরী একেবারে গোটা মুখে ভরিয়া দিয়া হাঁউ হাঁউ করিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল—বাবা, সিঁড়িতে পা দিয়েই অন্নপূর্ণার সঙ্গে চোখোচোখি! এমন সুখাদ্য যে জুট্‌বে বরাতে, তার আর আশ্চর্য্য কি!

মুখের কচুরীখানাকে গিলিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া পরিতোষ বলিল—বৌ এনেছিস সনৎ, তা আমাকে খবর দিতে নেই? এতদিন বৌদিদির প্রসাদ পেতে বঞ্চিত করা!

সনৎ বিরক্তি চাপিয়া সহজ ভাবে বলিল—কৈ, বৌ ত আনিনি।

পরিতোষ তার ছোট ছোট চোখ দুটো কৌতুকে নাচাইয়া বলিয়া উঠিল—আমার কাছে লুকোবে বাবা! তবু যদি না চোখোচোখি দেখা হয়ে যেত! মাইরি! কী সুন্দর বৌ তোর!

সনৎ বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ! কী যে বকো! বল্‌ছি আমার বৌ নয়!

পরিতোষ অবিশ্বাস-মেশানো কৌতূহলের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তবে ঐ সুন্দরীটি কে শুনি?

—উনি আমার একজন আত্মীয়।

পরিতোষ একটু মুচ্‌কি হাসিয়া চোখের পাতা নাচাইয়া শুধু বলিল—ও!

নীচে হইতে মলিনা সব কথা শুনিল। এই লোকটার চেহারা যেমন লালসাতুর, পরিচ্ছদ তেম্‌নি অশোভন, বাক্য তেম্‌নি কর্কশ অভদ্র—সে মনে মনে পরিতোষের উপর অত্যন্ত চটিয়া উঠিল। কিন্তু সে যে তাকে সনতের স্ত্রী বলিয়া ভুল করিয়াছে, সনৎ যে তাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিল, এতে তার মনের মধ্যে একটা কেমন সুখের সুর গুঞ্জন করিয়া উঠিল। লোকে তাকে সনতের স্ত্রী বলিয়া ভুল করিতে পারে এই সম্ভাবনা মনে হইতেই তার দুটি গাল অতিলজ্জায় গোলাপী হইয়া উঠিল, কিন্তু সেই

লজ্জার আড়ালে থাকিয়া একটু কোন্ অচেনা অজানা ছোট্ট সুখ তার কচি কোমল হাসিমুখখানি বাহির করিয়া থাকিয়া থাকিয়া উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল। আবার পরক্ষণেই যখন মনে হইল সনৎ বিবাহিত, তখন কি জানি কেন সেই অচেনা সুখের হাসিমুখখানি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল, ফোঁস করিয়া বড় জোরে একটা নিশ্বাস পড়িল।

পরিতোষ পরিতোষের সহিত জলখাবারের রেকাবিটা শূন্য করিয়া রাখিয়া সনৎকে আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। যে দিকে রান্নাঘর সেই দিকে একটু আগাইয়া যাইতেই পুঁটি তার পায়ের শব্দ পাইয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সামনে সুন্দরীর লজ্জাকাতর মুখের বদলে বুড়ী পুঁটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আবির্ভাব দেখিয়া পরিতোষ ভয় পাইয়া থম্‌কিয়া গেল। চোর চুরি করিতে গিয়া রোখা কুকুরের সাম্‌নে পড়িয়া যেমন ভ্যাবাচ্যাকা খায়—না পারে আগাতে আর না পারে পিছাতে, পরিতোষের অবস্থাও পুঁটির সাম্‌নে পড়িয়া তেম্‌নি হইল। পরিতোষকে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া যাইতে দেখিয়া পুঁটি একটু রুষ্ট তিরস্কারের স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি চাই বাবু?

পরিতোষ তাড়াতাড়ি তার এঁটো হাতটা আগাইয়া দেখাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিল—একটু কলে যাব, হাতটা ধোব।

—দাঁড়ান্ ঐখানে, আমি জল এনে দিচ্ছি।

পুঁটির হুকুমে সে থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সে মৎলব করিয়াছিল হাত ধুইবার ছল করিয়া আর-একবার মলিনাকে দেখিয়া লইবে, তাহা ত হইলই না, অধিকন্তু এই বুড়ীর পাল্লায় পড়িয়া পরিতোষ অত্যন্ত অকষ্ট-বদ্ধে পড়িয়া গিয়াছিল।

পুঁটি ঘটী করিয়া জল আনিয়া দাঁড়াইল। পরিতোষ তাড়াতাতি নত

হইয়া হাত বাড়াইয়া দিল এবং হাতে জল পড়িতে না পড়িতে "থাক হয়েছে" বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

বাহিরের ঘরে রাঘব বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল; রাঘবের নিবিড় কালো রং, তার মাথার চুলগুলি সব কামানো, ঠোঁটের উপর গোঁপ-জোড়াটি ধপ্‌ধপে সাদা; তাকে দেখিলেই কেমন মনে হইত সে চুমুক দিয়া দই খাইয়া আর ঠোঁট মোছে নাই। পরিতোষ সেই ঘরে আসিতেই রাঘব সচেতন হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিতোষ হতাশ ভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া দেহ এলাইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল—এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারো রাঘব।

রাঘব তামাক আনিতে গেল। পরিতোষ চেয়ারের পিঠের-দিকে মাথা-টাকে ঝুলাইয়া দিয়া গুনগুন করিয়া গাহিতে লাগিল—"আশে রেখেছি রে প্রাণ, তুমি কি আসিবে ফিরে!"

রাঘব হুঁকার মাথায় কল্কে চড়াইয়া ফুঁ দিতে দিতে পরিতোষের কাছে আসিয়া ডান বাহুতে বাঁ হাত যোগ করিয়া হুঁকা বাড়াইয়া ধরিল। পরিতোষ হুঁকা লইতে লইতে একবার দেখিয়া লইল রাঘবের মুখখানা যতই কালো ও প্রকাণ্ড হোক তার মধ্যে পুঁটির দৃষ্টির মতন উগ্রতা নাই। সে হুঁকায় এক টান দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা রাঘব, তুমি এবার পূজোর বক্‌শিশ চাইলে না ত?

রাঘব হঠাৎ এই উত্তম প্রসঙ্গের অবতারণায় উৎফুল্ল হইয়া অভিমান-ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—কি হবে বাবু চেয়ে, আপনি ত কখনো কিছু খান না, কেন মিছেমিছি আমার মুখ নষ্ট করি!

পরিতোষ পকেটে হাত ভরিয়া একটা সিকি বাহির করিয়া রাঘবের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল—এই নাও হে, এই নাও, নষ্ট মুখ মিষ্টি কোরো।

রাঘব খুসী হইয়া সিকি‍টি তুলিয়া লইয়া একটু হাসিল। পরিতোষ ধোঁয়া ছাড়িয়া একটু কাশিয়া গলার স্বরটা একটু নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা রাঘব, ঐ যে মেয়েটি, সে বাবুর কে হে?

—বাবুর আর কে হবেন বাবু, উনি বামুনদিদি, বাবুর রান্না করেন।

পরিতোষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—আরে! বলিস কিরে! বাম্‌নী! মাইনে-করা বাম্‌নী!

রাঘব পরিতোষের বিস্ময় লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া পরম উদাসীন ভাবে বলিল—এজ্ঞে তা ছাড়া আর কি? গরীব অনাথা বিধবা মানুষ, গতর না খাটালে পেট চল্‌বে কিসে?

পরিতোষ একবার বাড়ীর ভিতর যাইবার দরজার দিকে তাকাইয়া লইয়া গলার স্বর আরো একটু নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আর ঐ ডাল-কুত্তা মাগী? মেয়েটার কে হয় ও?

—কেউ হয় না, ও ঝি, ওদের মা মরে যেতে ওর হাতে মেয়েদের দিয়ে গিয়েছিল, ওই মানুষ-মুনুষ করেছে, সেদিন ছোট মেয়েটা মারা গেল, এখন দুজনে চাকরী ……

পরিতোষ রাঘবের কথার মাঝখানে বলিয়া উঠিল—ওঃ! হুঁকোটা রাখো ত রাঘব।

রাঘব হুঁকা ধরিতে না ধরিতেই পরিতোষ গঙ্গা-ফড়িঙের মতন রোগা রোগা পা ফেলিয়া তিন লাফে আবার উপরে সনতের ঘরের দিকে ছুটিল। কিন্তু উপরে উঠিয়াই তার সকল স্ফূর্ত্তি একেবারে হঠাৎ স্থগিত হইয়া গেল—সনতের ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি! পরিতোষ অতি ধীর শান্ত ভালোমানুষের মতন গুটিগুটি আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া হাতের কাছে যে বই পাইল খুলিয়া তারই উপর চোখ পাতিল—বইখানাও তার দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যাক্‌টেরিয়োলজি!

মলিনা পুঁটিকে পাঠাইয়াছিল সনৎকে জিজ্ঞাসা করিতে—বাবুটি ত খাবারটা খেয়ে গেল, আপনি এখন কি খাবেন ? বাজারের ঘিয়ের খাবারের চেয়ে কিছু ছানা আর ফলমূল আনাব কি ?

প্রশ্নের উত্তর শুনিবার আগেই পরিতোষ আবার হাজির। পুঁটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পুঁটি চলিয়া যাইতেই পরিতোষ একটু চাপা গলায় বলিল—দিব্যি রাঁধুনীটি রেখেছ ভাই—তোমার টেষ্ট্ আছে—কি সুন্দর দেখ্‌তে !

সনৎ বিরক্তি চাপিয়া বলিল—মানুষটি আরো সুন্দর।

—রাঁধেও খুব ভালো, না ? আজ জলখাবারে যে নমুনা পেলাম, মাইরি ! অমন সুন্দর লাল হাতের রান্না মিষ্টি হবে না ? আমায় কবে খাওয়াচ্ছ বলো ? তোমার কাছে আমার একটা খাওয়া পাওনা আছে···

পরিতোষ তার দুর্মুখ কাগজে সনৎ-ডাক্তারকে মাঝে মাঝে প্রশংসা করিয়া তার নাম প্রচার করে, এবং তারই বিনিময়ে তার খাবার দাবী সে সনতের কাছে পেশ করিয়া থাকে। সনৎ বলিল—আচ্ছা কাল বিকেলে এস, অন্নপূর্ণা-হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দেবো।

পরিতোষ দাঁত বাহির করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তোমার বাড়ীতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা থাক্‌তে আর অন্নপূর্ণা-হোটেলে যাচ্ছি না বাবা ! তোমার বাড়ীতে খাওয়াতে হবে। কাল আমি সন্ধ্যেবেলা আস্‌ব তোমার আত্মীয়া বামুনঠাক্‌রুণকে বোলে রেখো !

পরিতোষ এমন একটু জোর দিয়া সনৎকে 'তোমার আত্মীয়া বামুনঠাক্‌রুণ' বলিল যে সনতের মুখ লাল হইয়া উঠিল ; কিন্তু তার বলিবার কিছু নাই, সে নিজের মুখে মলিনাকে আত্মীয়া বলিয়া কবুল করিয়াছে। একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে সে রাঁধুনী বলিয়াও পরিচয় দিতে পারে নাই, কিন্তু একজন রাঁধুনীকে আত্মীয়া বলিয়া স্বীকার

করাটাও যে লোকের কাছে বেশ সঙ্গত হইয়াছে তাহা এখন পরিতোষের কথায় বোধ হইল না; সনৎকে নীরবে পরিতোষের ব্যঙ্গ সহ্য করিয়া থাকিতে হইল। পরিতোষ হাসিয়া বলিল—তুমি আজ বড্ড অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি—হবারই কথা। আর তোমাকে বিরক্ত কর্‌ব'না, এখন চল্‌লাম, কাল পুনর্দর্শনায় চ!

সনৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—রোসো, দেখি, কাল নয়, শনি-বার······

পরিতোষ উঠিয়া দাড়াইয়া বলিল—Very well, hope deferred is more the sweeter!

পরিতোষ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। নীচে নামিয়া একবার এদিক ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেই দেখিল্ সম্মুখে পুঁটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অন্ধকারে জ্বলজ্বল করিতেছে! পরিতোষ দাঁতের মধ্যে বিড়বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল—আঃ ডালকুত্তা মাগী ত ভারি জ্বালিয়েছে!

পরিতোষ চলিয়া যাইতেই সনৎ "আঃ!" বলিয়া যেন আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বিছানায় কাত হইয়া পড়িল। সে যে পরিতোষের নিমন্ত্রণ কাল হইতে একেবারে শনিবারে ঠেলিয়া সরাইয়া ফেলিতে পারিয়াছে, এও যেন একটা মস্ত নিষ্কৃতি, পরম অব্যাহতি। কালই যে মলিনাকে ঐ পশুটার সামনে বাহির হইয়া পরিবেষণ করিতে হইবে না, এতেই তার মন অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল।

পুঁটির পিছনে-পিছনে মলিনা একখানি থালায় গরম লুচি, পটল বেগুন ভাজা, ও সন্দেশ লইয়া সেই ঘরে আসিল। সনৎ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া সঙ্কোচে কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—আবার এসব কেন মলিনা? এই একটু পরেই ত ভাত খাব।

মলিনা লজ্জিত স্মিত মুখ নত করিয়া থালা আনিয়া সনতের সাম্‌নের

টেবিলে রাখিল। পুঁটি বলিল—ভাত হতে এখনো ত দেরি আছে। তা ছাড়া বাগবাজার থেকে সর্ব্বেশ-বাবুর বাড়ীর লোক এসেছে, সর্ব্বেশ-বাবুর ব্যামো বেড়েছে। আমি তাকে বাইরে বসিয়ে রেখেছি।

এই দুটি মাইনে-করা লোকের কাছ থেকে পরম আত্মীয়ের মত যত্ন ও সুশ্রূষা পাইয়া সনৎ ক্রমশই মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছিল; কিন্তু পুঁটি ও মলিনা মনে করিতেছিল ডাক্তার-বাবু যে উপকার করিয়াছেন সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করিতে পারা তাদের জীবন পাত করিলেও সাধ্য হইবে না। এইরূপে উভয় পক্ষই পরস্পরের নিকট হইতে আশাতীত লাভ করিতেছে মনে করিয়া প্রতি পলে পলে অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

(৪)

সর্ব্বেশ-বাবুর বাড়ীর ডাকে ডাক্তারকে বাহির হইতে হইবে। সনৎ ডাকিল—রাঘব!

রাঘব তার মিশ্‌কালো মুখের মাঝে শাদা গোঁপ লইয়া আসিয়া হাজির হইল।

—মোজা কিনে এনে কোথায় রেখেছিস?

—আজ্ঞে মোজা ত কিনিনি।

সনৎ মুখ খিচাইয়া বলিয়া উঠিল—মোজা ত কিনিনি! ষ্টুপিড তোকে বলিনি সকালে কিনে আনতে।

—আজ্ঞে তা ত বলেছিলেন ......

—তবে আনিস্‌নি কেন রাঘব-বোয়াল?

—আজ্ঞে বামুনদিদি পয়সা ভায়নি তা আমি কি করব।

সনতের মুখ রুদ্ধ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে দাঁত মুখ

খিচাইয়া চেঁচাইতেছিল, এখন আস্তে বলিল—আমার কাছে পয়সা চাইলিনে কেন ?

—বামুনদিদি বল্‌লে, বাবুর বারো জোড়া মোজা আছে, আর কিন্‌তে হবে না।

সনৎ চাপা গলায় ভর্ৎসনা ভরিয়া বলিল—আরে মোজা ত তোর বামুনদিদি পর্‌বে না, পর্‌ব আমি ; তাকে বল্‌লিনে কেন যে সেগুলো গুন্‌তিতে যতই হোক, তার একটারও গোড়ালি নেই. আঙুলের ডগাগুলো ও হাওয়া খেতে মুখ বাড়ায়। যা দৌড়ে, এক জোড়া মোজা কিনে আন্ - সাড়ে ন নম্বর, বুঝ্‌লি ?

সনৎ মনিব্যাগ খুলিয়া একটা টাকা রাঘবের সাম্‌নে ফেলিয়া দিয়া বলিল—প্যাণ্টালুন আর কোটের যে বোতামগুলো ছিঁড়ে গিয়েছিল টেকে রেখেছিস্ ?

টাকা তুলিয়া লইয়া রাঘব বলিল—আজ্ঞে না, চাবি পাইনি, চাবি যে আজকাল বামুনদিদির কাছে থাকে।

সনৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—যা, চাবিটা চেয়ে এনে দে, আর মোজার সঙ্গে কিছু বোতাম আর ছুঁচ-সুতোও কিনে আনিস্। আমি এখন বোসে বোসে বোতাম টাঁকি, আর ওদিকে আমার রোগী টেঁসে যাক !

অপ্রকাশ বিরক্তিতে সনতের মন একেবারে গস্‌গস্ করিতেছিল। তার মনে হইতেছিল, মলিনা হইত যদি তার স্ত্রী কি বোন ত এতক্ষণ বকিয়া চেঁচাইয়া বাড়ী ফাটাইয়া দিত—মাইনে-করা লোককে, বিশেষ ত সুন্দরী যুবতী পরকে, ত বকা চলে না।

রাঘব চাবি আনিয়া দিয়া বাজারে যাইবার জন্য চলিয়া গেল। সনৎ নিরুদ্ধ বিরক্তি প্রকারান্তরে প্রকাশ করিবার জন্য দুমদুম করিয়া বাক্‌স দেরাজ খুলিতে লাগিল। সনৎ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল তার কোট প্যাণ্ট

কেউ কোথাও বোতামহীন হইয়া নাই,—কোটের হাতার অকেজো বোতামগুলার মধ্যেও যেগুলা আধখানা ভাঙিয়াছিল বা বাঁধন আল্‌গা হইয়া নড়-নড় করিত, তাদেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে; ছেঁড়া পকেট জোড়া লাগিয়াছে; ছেঁড়া মোজাগুলিতে ভিতর হইতে বেমালুম তালি লাগিয়াছে, তালি-দেওয়া মোজাগুলি ধোবার বাড়ী হইতে ইস্ত্রি হইয়া নবজন্ম লাভ করিয়া আসিয়াছে; দেরাজের মধ্যে এক ডজন পাড়-সেলাই নূতন রুমাল আর তাদের কোণে কোণে লাল রেশমী সুতোয় অতি ছোট ছোট অক্ষরে সেলাই করা আছে সনতেরই নামের আদ্যক্ষর S বা স। সনতের মুখ অকারণ রাগের লজ্জায় ও অভাবনীয় বিস্ময়ের আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তার রাগ ত অনুরাগে পরিণত হইবার মতন অবস্থা হইল। সে তখন সর্ব্বেশ-বাবুর রোগ ও ডাক্তারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া, তার দেরাজের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে যে একজন অন্তরালবর্ত্তিনীর মমতা-ভরা সেবা তারই মাধুর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে একেবারে ডুবিয়া গেল। সনতের ইচ্ছা করিতে লাগিল এই নীরব সেবা নীরবে স্বীকার না করিয়া মলিনাকে ডাকিয়া কিছু বলে। কিন্তু কি বলিবে সে?

রাঘব মোজা ছুঁচ সুতা বোতাম আনিয়া সনতের কাছে রাখিতেই সনৎ রাঘবের নেড়া মাথায় এক চাঁটি মারিয়া হাসিয়া বলিল—গাধা! আমার একটা টাকা মিথ্যে নষ্ট করলি!

রাঘব ব্যাপার কি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিল—তার প্রভু হাসিতেছেও, বকিতেছেও। ব্যাপার কি!

বাড়ীর নীচে রাস্তায় মোটরের সিঙা ভঁক্‌ ভঁক্‌ করিয়া সাড়া দিল বাহন হাজির। সনৎ তাড়াতাড়ি সজ্জা সমাপ্ত করিয়া ষ্টেথিস্কোপটা পকেটে গুঁজিতে গুঁজিতে বড় হাসিমুখে পরিপূর্ণ মনে রোগী দেখিতে বাহির

হইয়া গেল। আমরা জানি সেদিনকার এক প্রেস্‌ক্রুপ্‌সানেই সর্ব্বেশ-বাবু মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন এবং এখনো তিনি সনৎ-ডাক্তারের হাতযশের প্রশংসা যখন-তখন যেখানে-সেখানে করিয়া বেড়াইতেছেন।

(৫)

পরিতোষ আগে কালেভদ্রে আসিত; মলিনাকে দেখিয়া গিয়া অবধি সে এখন নিত্যকার আগন্তুক। সনৎ ডাক্তার-মানুষ, সে কখন্ বাড়ী থাকে আর কখন্ থাকে না তার কোনো নিয়ম বা স্থিরতা নাই; পরিতোষ যখন আসে তখন কোনো দিন বা সনৎ বাড়ীতে থাকে, কোনো দিন বা থাকে না। সনৎ বাড়ী না থাকিলেও পরিতোষের পরিতোষ ছাড়া কোনোরকম দ্বিধা বা সঙ্কোচের লক্ষণ দেখা যায় না। সে বিড়ালের মতন নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাড়ীর ভিতরে যায়, সিঁড়িতে ওঠে, উপরে গিয়া নির্জ্জন ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এমনি করিয়া সে বারম্বার মলিনার অতর্কিতে তার সাম্‌নে নিজেকে আনিয়া উপস্থিত করে। এতে মলিনা মনে মনে বিরক্ত হয়, পুঁটির সতত সতর্ক প্রহরীর দৃষ্টি রূঢ় ও তীক্ষ্ণ হইয়া ওঠে; কিন্তু তারা মুখ ফুটিয়া বাবুর বন্ধুকে কিছু বলিতেও পারে না। পরিতোষ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়া উপরের ঘরে পৌঁছিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে, নাচে বা সিঁড়িতে বা উপরেরই ঘরে যেখানেই হোক বা যখনই হোক, মলিনাকে প্রথম একলা দেখিতে পাইলেই অমনি প্রশ্ন করে—"সনৎ বাড়ীতে আছে?" মলিনা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সরিয়া গেলেও সে বলিতে থাকে—"কখন্ আস্‌বে বল্‌তে পারো?" কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব সে মলিনার কাছ থেকে কখনো পায় না, তার সাড়া পাইবা মাত্র সেই প্রশ্নের জবাব দিতে যে লোক তৎক্ষণাৎ তার সাম্‌নে আসিয়া

উপস্থিত হয় তার দিকে আর চোখ না ফিরাইয়া পরিতোষ মুখ ফিরাইয়া অন্য কিছুতে নিবিষ্ট হইয়া পড়ে এবং দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিয়া ওঠে—"ডালকুত্তা মাগী !" যেদিন সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া দেখে একাকিনী মলিনা গৃহসংস্কার করিতেছে, সেদিন সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মলিনার সত্বর পলায়নের পথ রোধ করিয়া অনাবশ্যক প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া করিয়া তার সঙ্গে কথা জমাইবার চেষ্টা করিতে থাকে ; কিন্তু অকস্মাৎ পিছন ফিরিয়াই দেখে পুঁটি কখন্ আসিয়া ঠিক একেবারে তার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে, অথবা হঠাৎ তার পিঠের দিক হইতে তার প্রশ্নের জবাব শুনিয়া সে চম্‌কিয়া উঠে। তখন সেই ভয়ানকের দিকে পিছন ফিরিয়া থাকা আর তার চলে না, সে সর্ব্বাঙ্গে কেমন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে, মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে, সে তাড়াতাড়ি সরিয়া গিয়া মলিনা হইতে অনেক দূরে একটা যে-কোনো জায়গায় বসিয়া পড়ে। তখনি মলিনা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যায়, আর তার অপস্রিয়মান মূর্ত্তিখানিকে দেখিবার জন্য চোখ ফিরাইলেই চোখে পড়ে পুঁটির দুটা বড় বড় তীক্ষ্ণ চোখ ! মলিনার অন্তর্ধানের পর পুঁটি চলিয়া গেলে পরিতোষ দাঁতের মধ্যে কথা চিবাইয়া বলিয়া ওঠে— "ডালকুত্তা মাগী !" পুঁটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের ধাক্কাটা অল্পক্ষণেই সাম্‌লাইয়া লইয়া পরিতোষ দিব্য সপ্রতিভ ভাবে চেঁচাইতে থাকে—ওরে রাঘব, একটু তামাক দিয়ে যা রে ! ওরে তোদের বামুনদিদিকে জিজ্ঞেস কর্ ত, কিছু খেতে-টেতে দেবেন কি তিনি ? বামুন জাত, খেতে পেলেই খুসী। ভাখ্ তোদের বামুন-দিদিকে বলিস্, এই আস্‌ছে শনিবার আমার নেমন্তন্ন আছে ; তোদের বাবু যেরকম হুঁসোকান্ত, বাড়ীতে বল্‌তেই ভুলে যাবে হয়ত। আমি চিংড়ি-মাছটা বড় ভালোবাসি, বুঝ্‌লি ? চিংড়ি-মাছের মালাই-কারী আর মাটনের দোপেঁয়াজা আমাকে যে খাওয়ায়

আমি তার পায়ের পয়জার মাথায় বই, জানিস্? তার সঙ্গে দুটিখানি বেশ প্রচুররকম পেস্তা-কিশমিশ-দেওয়া জর্দ্দা পোলাও, আর শেষ কালে একটু বড়বাজারের রাব্ড়ি, গোটা চারেক কোরে ভীম-নাগের সন্দেশ আর দীনু-ময়রার রসগোল্লা, বাস্ আর কিছু না—এই অল্প-স্বল্প হলেই আমার তোফা খাওয়া হয়। উঃ বলিস্ কি রে! বল্তে বল্তেই মুখে আমার জল সর্ছে। যা দেখি, বামুনদিদি এই লোভী পেটুককে কি দিয়ে তুষ্ট করেন দেখি! বাপ মা নামটা রেখেছিল পরিতোষ—কিন্তু ঘোড়ার ডিম!—এম্নি পোড়া কপাল, একদিনও কোনোরকমে পরিতোষ কেউ কর্লে না!

এম্নি করিয়া অনর্গল একাই বকিয়া, মলিনার উদ্দেশে প্রচ্ছন্ন রসিকতা ছড়াইয়া, কিছু না কিছু খাবার আদায় করিয়া পরিতোষ চলিয়া যাইত; সনতের সহিত কোনো দিন অকস্মাৎ দেখা হইয়া যায়, অধিক দিন হয়ই না, কিন্তু তার জন্য তার কোনোরকম উদ্বেগ বা দুঃখ দেখা যায় না—দেখা না হইলেই সে যেন সুখী হয়, অথচ যাইবার সময় বাতাসকে বলিয়া যায়—সনৎটা ত এখনো এলো না, বড় দর্কার ছিল—দেখি, যদি কাল আস্তে পারি।" পরিতোষের কথায় সন্দেহ প্রকাশ পাইলেও কাল যে সে আসিবে নিশ্চয় এ সম্বন্ধে মলিনা পুঁটি বা রাঘব—বাড়ীর তিনটি প্রাণীর কারো এতটুকুও সন্দেহ থাকিত না।

এইরূপে শনিবার আসিয়া পড়িল। পরিতোষের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবার ভয়ে সনৎ শুক্রবার সমস্ত দিনই বাহিরে বাহিরে ফিরিয়া অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরিয়াছিল। শনিবারও সমস্ত দিন সে বাহিরে-বাহিরেই কাটাইয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিল। সনৎ মৎলব করিয়াছিল পরিতোষ আসিলে তাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিবে—সে কাজের ভিড়ে তার নিমন্ত্রণের কথা একদম সাফ ভুলিয়াই গিয়াছিল, বাড়ীতে কিছুরই

আয়োজন করা হয় নাই। পরিতোষকে তার পরে হোটেলে লইয়া গিয়া খাওয়াইয়া বিদায় করিয়া দিবে। সনৎ বাড়ীতে ফিরিয়া উপরে উঠিয়াই দেখিল পরিতোষ ইজিচেয়ারে দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে কাত হইয়া আল্‌-বোলায় তামাক ফুঁকিতেছে। তাকে আচম্‌কা দেখিয়াই পথে সাপ দেখিয়া পথিকের মতন সনৎ চম্‌কিয়া উঠিল। সনৎ যে-সব নাটকীয় ধরণ অভিনয় করিবে বলিয়া এই কয়দিন হইতে মনে মনে মহলা দিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল, পরিতোষকে দেখিয়া সে-সমস্তই তার ভুল হইয়া গেল, সে বিরক্তিচাপা স্বরে বলিয়া উঠিল—এই যে বন্ধুবর এসে হাজির!

পরিতোষ চোখ দুটা ঢুলুঢুলু করিয়া মদিরাস্খলিত স্বরে বলিল—বাবা! বামুনের নেমন্তন্ন! আস্‌ব না বাবা! খাওয়ার আগে থেকে রান্নার গন্ধে খিদেটা কি রকম জেঁকে ওঠে, বামুন তুই, তোর জানা উচিত!

পরিতোষের আগমনেই সনৎ বিরক্ত, তার উপর সে মদ খাইয়া আসিয়াছে। সনৎ এবার স্পষ্ট বিরক্ত স্বরে বলিল—ভদ্রলোকের বাড়ী মদ খেয়ে এসেছ ষ্টুপিড!

—ফস্‌ কোরে যে ষ্টুপিড বোলে ফেল্‌লে, কথাটার ডেরিভেসান্‌ জানো কি বাবা? —ইষ্টং কিনা অভিলষিতং স্বার্থং, পিনষ্টি কিনা পেষতি মর্দ্দতি কুট্টতি যঃ সঃ ষ্টুপিড! আমি ইষ্টটি একটুও নষ্ট হতে দিইনি বাবা! Only one peg—a little appetiser! যে-রকম আয়োজন তার উপযুক্ত কোরে খিদেটাকে চান্‌কে নিতে হবে ত চাঁদ!

সনৎ বিরক্ত হইয়া বলিল— কিচ্ছু আয়োজন করিনি! সাফ ভুলে বোসে আছি। চলো, তোমাকে হোটেলে গিলিয়ে দিগে।

—কিচ্ছু ব্যস্ত হয়ো না বাবা! তুমি ভুলে গেছ বোলে আমি ত ভুলিনি। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—স্বহস্তে বাজার কোরে আনা হয়েছে, রান্না প্রায় সমাপ্ত! বাঁকা মদনমোহন, তোমার ধড়াচূড়া ছেড়ে মোহন-

বাঁশী রেখে হাত মুখ ধুয়ে এসে প্রস্তুত অন্নে বোসে যাও বাবা—দোপেঁয়াজা মালাইকারী! উহু! সর্ব্ব শরীর-মন কেমন মাইরি মাইরি কর্‌ছে বাবা!

বলিতে বলিতে পরিতোষ গান ধরিল—

নাম-পরতাপে যার ঐছন করিল গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
পাতেতে পড়িয়া যবে উদরে পশিবে গো
সে সুখ জানাব আমি কারে।
ওরে সনৎ সাঙ্গাতি মোর—খুলহ বন্ধনডোর—
এসে ঝট্ বোসে পড়ো পাতে,
শ্রবণে এতেক মধু, পরশে কতেক গো,—
স্বরগ মিলিবে হাতে হাতে!
ওগো ও পরাণ-বঁধু!

সনৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—মাতলামি কোরো না বল্‌ছি, চুপ কোরে খেয়ে নিয়ে নরকে বিদেয় হও। তোমার জন্যে স্বর্গ ত বোসে কাঁদ্‌ছে।

পরিতোষ সোজা হইয়া উঠিয়া বলিল—মাতাল হয়, যারা ছোটলোক! ভদ্দরলোক আবার মাতাল কিরে? নরকটা রেখে দিয়েছি পরকালের জন্যে, অনেক বন্ধুর দেখা সেখানে মিল্‌বে, একলা স্বর্গে তিষ্ঠতে ত পার্‌ব না; স্বর্গ-সুখটা এ পারেই সেরে নিচ্ছি। আজকের 'দুর্ম্মুখ' দেখেছিস?

—না। ঐ আঁস্তাকুঁড়ের ন্যাকড়া ভদ্রলোকে ছোঁয়?

—ইস্! যে মাগী যত নষ্ট তার তত শুচিবাই হয়। দ্যাখ্, তোর রাইভ্যাল্ শম্ভু-ডাক্তারকে কীরকম ঠুকেছি—তার মা মাসী বোন যে

যেখানে ছিল তাদের নষ্ট কুষ্ঠি উদ্ধার কোরে ছেড়ে দিয়েছি! কোনো ভদ্দর পেশেণ্ট্ আর তাকে বাড়ীতে ডাকৃছে না—তার দফা একেবারে সেরে দিয়েছি!

—বড় কাজই করেছ! ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়েদের কুৎসা গাওয়া বড় পৌরুষ! তুমি যার পেছু লাগো, লোকে তাকেই আরো বেশী আস্থা করে। তুমি নাকি বিগ্যারত্ন-মশায়কে চাবুক মারৃতে হয় লিখেছ?

—লিখ্‌ব না! আহাম্মক বলে কিনা যে বাঙালী ব্রাহ্মণরা খাঁটি আর্য্য নয়। এমন অপমান কোন্ আর্য্যসন্তান সুব্রাহ্মণ সহ্য করৃতে পারে!

সনৎ হাসিয়া বলিল—ও তা বটে! "আমরা আর্য্য-শিশু!"

পুঁটি তুইখানা আসন ও একখানা থালায় বসাইয়া তু'গেলাস জল লইয়া ঘরে আসিল। সনৎ তাহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িতে ঘরের অপর পাশে জাপানী ছবি-আঁকা কাঠের পর্দ্দার আড়ালে চলিয়া গেল।

সনৎ ও পরিতোষ আসনে গিয়া বসিয়াছে। মলিনা ফর্সা কাপড় ও শেমিজ পরিয়া, মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া, তুই হাতে খাবারের এক-খানি থালা ধরিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করিল, তখন সনৎ অপাঙ্গে একবার তার দিকে দেখিয়া মাথা নত করিল, আর পরিতোষ তার লালসায় লুলিত মদিরাজড়িত চক্ষে তার দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া রহিল, অন্ধকারে যে পুঁটির চোখ তুটা রাগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল সে তাহা লক্ষ্য করে নাই। পরিতোষ নিমন্ত্রিত, তাকেই আগে মলিনা খাবারের থালা দিল; থালা পরিতোষের সাম্‌নে রাখিবার জন্য যখন মলিনা নত হইয়াছে তখন পরিতোষের চোখ তুটা যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। মলিনা সনতের জন্য খাবার থালা আনিতে গেল। পরিতোষ আরামের নিঃশ্বাস টানিয়া বলিয়া উঠিল—আঃ! ঘ্রাণেন অর্দ্ধভোজনম্! I congratulate

you on your good taste—the Cook—Ah ! she is a beauty ! A gem !

মলিনা আবার থালা লইয়া উপরে আসিল। এই পশুটার সাম্‌নে মলিনাকে সনৎ বাহির হইতে বাধ্য করিতেছে এ যেন তার অন্যায় অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া সে আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাঁধুনী পরিবেষণ করিবে না ত কে করিবে? কিন্তু সনতের মনে হইতেছিল আজকার দিনের জন্য একটা ঠিকে বামুন নিযুক্ত না করিয়া সে অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে।

পরিতোষ গোগ্রাসে পটলের দোল্‌মা ও চিংড়ি-মাছের কাট্‌লেট গিলিয়া বলিল—সনৎ, আরো গোটাকতক দোল্‌মা আর কাট্‌লেট দিতে বলো ত।

মলিনা সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়াইয়া ছিল কার কি চাই জানিবামাত্র শীঘ্র আনিয়া জোগাইবার জন্য। সনৎ সিঁড়ির দরজার দিকে বসিয়া ছিল, সে মলিনার মাথায় ঘোম্‌টার সাদা কাপড়টা দেখিতে পাইতেছিল; মুখ তুলিয়া কিছু বলিবার আগেই সনৎ দেখিল সেই শুভ্রতাটুকু নামিয়া গেল। তাই সে আর কিছু বলিল না। পরিতোষ বলিয়া উঠিল—বলো না হে!

সনৎ শুধু বলিল—তুমি গিলে যাও, সব আস্‌ছে।

সনতের রূঢ় অপমান গ্রাহ্য মাত্র না করিয়া পরিতোষ গিলিতে লাগিল। মলিনা দোল্‌মা ও কাট্‌লেট আনিয়া পাতে ফেলিতে না ফেলিতে পরিতোষ বলিল—আর-একটু মালাই-কারী! আঃ! কী রান্নাই হয়েছে মাইরি! স্বর্গ যেন সুধা দিয়ে বসুধার ক্ষুধা মেটাচ্ছে!

সনৎ বিরক্ত হইয়া চাপা গলায় বলিল—তোমার উপমাটা ঠিক হল না—যেন সীতা হনুমানকে গেলাচ্ছেন!

পরিতোষ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—The idea! Fine indeed!

পরিতোষ বারম্বার একটা না একটা জিনিস চাহিয়া ঘন ঘন মলিনাকে নিজের কাছে আনিতেছিল। মলিনার মুখ সিঁড়ির দরজার কাছে প্রকাশ পাইয়া ক্রমশ উঠিয়া উপরে আসিতেছে দেখিয়াই একবার পরিতোষ বলিয়া উঠিল—ওহে ভালো কথা। সোনাগাছির ছোট ডালিম বল্‌ছিল—ডাক্তার-বাবু আসেন না কেন আর? অনেক দিন আসেননি......

মলিনা চৌকাঠে হোঁচট লাগিয়া পড়িতে পড়িতে সাম্‌লাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল; পরক্ষণেই সে অগ্রসর হইয়া পরিতোষকে পরিবেষণ করিতে আসিল।

মলিনার সাম্‌নে এই কথা উত্থাপন করায় সনৎ বিরক্তি ও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। তার ইচ্ছা হইল পরিতোষের ঘাড় ধরিয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দ্যায়। কিন্তু সে-যে দুর্ম্মুখের সম্পাদক, তাকে চটানো বড় সোজা নয়, সে তাহা হইলে তার ভরা পসার কুৎসার কালিতে ঢাকিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ছাড়িবে। সনৎ বলিল—কল্ না দিলে ডাক্তার ত আর এম্‌নি রোগী দেখ্‌তে যায় না; অসুখ হয়ে থাকে কল্ দিলেই যাব।

পরিতোষ হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, আমি ডালিমকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম—তোমার কি অসুখ হল আবার, যে ডাক্তার-বাবুকে চাই? তাতে ডালিম বল্‌লে—ডাক্তার-বাবুকে বোলো আমার হার্ট-ডিজিজ্ হয়েছে!

পরিতোষ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সনৎ দাঁতের উপর দাত চাপিয়া লাল হইয়া বসিয়া রহিল। আর মলিনা

কোনোমতে সিঁড়িতে পা দিয়াই ঢালু জায়গায় জলের স্রোতের মতন তর তর করিয়া নীচে নামিয়া চলিয়া গেল।

পরিতোষ গিলিল প্রচুর। কিন্তু সনতের পাতে সব খাবারই পড়িয়া রহিল, মলিনার রান্নাও আজ তার মুখে রুচিতেছিল না।

সনতের পাতে অনেক খাবার পড়িয়া আছে দেখিয়া পরিতোষ বলিয়া উঠিল—তুই বামুন, না ডোম? অমন সব সুখাদ্য অপ্‌চ করিস! আমায় দিলে আমি রুমালে বেঁধে বাড়ী নিয়ে যেতাম!

সনৎ বিরক্ত হইয়া বলিল—গেলা হল? এখন উঠ্‌বে, না সারা রাতই বক্‌বে আর গিল্‌বে?

পরিতোষ বাঁ হাত তুলিয়া বলিল—রোসো বাবা, খেয়েনি বেশ কোরে—শাস্ত্রের উপদেশ আছে—

পরের অন্ন পেলেই ভায়া দেহের মায়া ছাড়্‌বে!
দুর্লভ তা, শরীর ত ভাই জন্মে-জন্মেই কাড়্‌বে!

ইতিহাসের কিছু চর্চ্চা রাখিস্‌ কি? এক ছাতুখোর মহারাজা বড়লাটকে নেমন্তন্ন কোরে খাইয়ে কুশলপ্রশ্ন করেছিল—"কেঁও সাহাব, ক্যাঁচরকুট ভৈল্‌?" দোভাষী যখন লাটসাহেবকে সেই বাক্যের মাধুর্য্য ব্যাখ্যা কোরে হৃদয়ঙ্গম করিয়ে দিলে তখনই বড়লাট তাঁর ফরেন্‌ সেক্রেটারীকে ডেকে বোলে দিলেন—রাজাটিকে ডিপোজ্‌ কর্‌বার হুকুমনামার মুসাবিদা কাল চায়ের টেবিলেই যেন দেখ্‌তে পাই। বাস্‌! এক কুশলপ্রশ্নেই মহারাজার গদি ফর্সা! আমাকেও ও-প্রশ্ন কোরো না বাবা, খেয়ে যেতে দাও—নেমন্তন্ন কোরে ক্যাঁচরকুট ভৈল্‌ কি না প্রশ্ন করা smacks of ill manners! হিষ্ট্রি টিষ্ট্রি একটু আধটু পোড়ো, কেবল নাড়ী টিপে বেড়িও না।

সনৎ পরিতোষের আড়ষ্ট জিভে শ ও স এবং ড় ও র এবং য় ও অ

অভেদ উচ্চারণ হইতে শুনিয়া বিরক্ত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। পরিতোষ তাহা গ্রাহ্যই না করিয়া চাহিল--একটু জল।

জল দিতে আসিল পুঁটি। তাহা দেখিয়াই পরিতোষের এমন খাওয়ার সব সুখ মাটি হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল—থাক্, চাপন খাওয়ার পর বেশী জল খাওয়া উচিত নয়, বিশেষ ত ডাক্তারের বাড়ীতে—

পুঁটি ফিরিয়া গেল। পরিতোষ দাঁতের মধ্যে বিড়বিড় করিয়া বলিয়া উঠিল—ডালকুত্তাটা পেছনে পেছনে লেগেই আছে! সুখটানটা একদম মাটি!

পরিতোষ আঁচাইল, পান খাইল, তামাক টানিল। তার পর অনেক রাতে সনংকে অব্যাহতি দিয়া বাড়ী ছাড়িল। কিন্তু আর সে মলিনাকে দেখিতে পাইল না। তখন তার মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া উঠিল গানের একটি কলি—আশে রেখেছি রে প্রাণ, সে কি রে আসিবে ফিরে।

(৬)

সে রাত্রে সনৎ যখন নিজের সাল্থের বাড়ীতে ফিরিল তখন রাত্রি একটা। সনতের মোটরের শিঙা বাজিয়া উঠিতেই সনতের স্ত্রী সুবাসিনী একটি লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সনৎ বাড়ীতে ঢুকিয়া দরজার খিল বন্ধ করিয়া দিয়া সুবাসিনীর হাত ধরিয়া বলিল—তুমি দরজা খুল্‌তে এলে যে? চাকর-ঝিগুলো কোথায় গেল?

সুবাসিনী স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে আলো দেখাইয়া যাইতে যাইতে বলিল—আহা, সমস্ত দিন খেটেখুটে ঘুমিয়ে পড়েছে; ওদের ঘুম যতক্ষণে ভাঙাব, ততক্ষণে ত আমিই এসে দরজা খুলে দিতে পার্‌ব।

সনৎ বলিল—তোমার ঘুম ভাঙ্‌ল আর ঐসব নবাবপুত্তুরদের ঘুম ভাঙে না।

—আমি ত ঘুমুইনি—এই আস্‌ছ, এই আস্‌ছ কোরে জেগেই কান খাড়া কোরে ছিলাম।

—এত রাত পর্য্যন্ত ঘুমোওনি! এ ভারি অন্যায় তোমার। এ রকম করলে অসুখে পড়্‌বে যে।

সুবাসিনী হাসিয়া স্বামীর মুখের দিকে উচ্ছ্বসিত প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—তবে তুমি ডাক্তার রয়েছ কি কর্‌তে?

সনৎ স্ত্রীর হাতখানি একটু চাপিয়া ধরিল, কিন্তু তার মুখ এই প্রণয়-সুখে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল না। সুবাসিনী ইহা লক্ষ্য করিল। ঘরে গিয়া আলো রাখিয়া সে স্বামীর কোটের বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল—তুমি আজকাল সদাই অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবো বলো দেখি?

সনৎ একটু চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল—কী আর ভাব্‌ব, রোগীদের ভাব্‌না ভাবি। কত লোকে তাদের জীবন আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আশা কোরে থাকে, আমরা তাদের বাঁচাব, আমরা তাদের যন্ত্রণা নিবারণ কর্‌ব। এ দায়িত্বের ভাবনা কি কম?

সুবাসিনী তার সুন্দর মুখখানি স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল—সত্যি! তোমার পশার যত বাড়্‌ছে তত আমি তোমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাচ্ছি; এখন তুমি ভোর না হতে কল্‌কাতায় যাবার জন্যে ছটফট করো, কত রাত্তির কোরে বাড়ী ফেরো, কোনো কোনো দিন ত ফেরোই না, এই আস্‌ছ এই আস্‌ছ কোরে জেগেই আমার রাত্তির কেটে যায়......

সনৎ স্ত্রীকে দুই হাত দিয়া ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—রাত হয়েছে, চলো শুতে যাই।

সনৎ স্ত্রীকে আদর করিল, প্রীতি জানাইল, কিন্তু তার আচরণে কোথায় একটু কৃপণতা ছিল যাতে সুবাসিনীর চিত্ত তৃপ্তি অনুভব করিল না; সে অনুভব করিতেছিল তার স্বামী যেন কেমন কর্ত্তব্য পালনের রীতি রক্ষা করিতেছে মাত্র, তার আচরণে প্রাণের আগ্রহ নাই, আন্তরিকতার ব্যগ্রতা নাই, যৌবনের উদ্বেগ নাই, প্রণয়ের উল্লাস নাই। দুনিয়ার রোগীগুলা জুটিয়া তার স্বামীকে যে এমন অন্যমনস্ক করিয়া তুলিতেছে তার জন্য সুবাসিনী তাদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল; —তারা চটপট ভালো হইয়া উঠিলেই ত পারে, তারাও কষ্ট কম পায়, পয়সাও তাদের কম খরচ হয়, আর ডাক্তারেরও হাতযশ বাড়ে ও ভাবনা কমে। সে মনে মনে সকল রোগীর সত্বর আরোগ্য কামনা করিতে করিতে স্বামীর বুকের কাছে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সনৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিদ্রিতা প্রেমময়ী সুন্দরী তরুণী পত্নীর কপালে ধীরে ধীরে একটি চুম্বন করিল।

সনতের বাড়ীর চেয়ে বাসাটাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। সে কোনোমতে রাতটুকু বাড়ীতে কাটায়, তাও সব রাত্রে তার আসা ঘটে না— রোগী বা হাসপাতাল পাহারা দিবার জন্য তাকে কলিকাতাতেই থাকিতে হয়। বাসায় থাকায় তার কোনো কষ্ট বা অসুবিধাও নাই; সে রোগী দেখিয়া এগারোটার সময়ই বাড়ী ফিরুক বা তিনটার সময়ই বাড়ী ফিরুক সে ঠিক গরম ভাত প্রস্তুত পায়; মলিনা সমস্ত তরকারী রাঁধিয়া ভাতের জল চড়াইয়া বসিয়া থাকে, সনতের মোটরের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়া সনতের আগমন ঘোষণা করিলেই সে চাল ফেলিয়া দ্যায় এবং সনৎ কাপড় ছাড়িয়া স্নান করিয়া মাথা আঁচড়াইয়া প্রস্তুত হইতে না হইতেই গরম অন্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। রাত্রেও সে যত দেরী করিয়া আসুক না কেন, তার জন্য মলিনা রাত জাগিয়া বসিয়া থাকে। সনৎ কুণ্ঠিত হইয়া কত

দিন মলিনাকে উদ্দেশ করিয়া পুঁটিকে বলিয়াছে—"তোমরা এত রাত পর্য্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা কোরে কষ্ট পাও কেন পুঁটি-মাসী? আমার খাবার আমার ঘরে ঢেকে রেখে গেলেই ত পারো।" তাতে পুঁটি হাসিয়া উত্তর দিয়াছে—"এও কি একটা কথা হল বাবা? আপনি যদি অসুবিধাই ভোগ করবেন তবে আমরা রয়েছি কি করতে?" সনৎ খুব প্রবীণ মুরুব্বির মতন যদি বলিত—"মলিনা ছেলেমানুষ, তার কষ্ট হয়।" তবে পুঁটি উত্তর দিত—"আপনার জন্যে কষ্ট করা সে ত মলিনার ভাগ্যি বাবা। আপনার ধার সে কি কখনো শুধ্‌তে পারবে?" এই কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস সনৎকে একেবারে নির্ব্বাক অপ্রস্তুত করিয়া ফেলিত। মলিনার সযত্ন সেবা প্রত্যেক বিষয়ে এমনি স্পষ্ট পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাই অনুভবে সম্ভোগ করিয়া সনতের মন অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; সনতের আসন বসন শয্যা পুস্তক সব তাতেই মলিনার হাতের স্পর্শ, সযত্ন সেবার চিহ্ন প্রতিক্ষণে নব নব আকারে প্রকাশ পায়; একটু আগে যে ঘর সে এলোমেলোর মেলা করিয়া কুশ্রী করিয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াই দেখে সে ঘর আবার শৃঙ্খলায় পরিপাটী সুন্দর সুশ্রী হইয়া মলিনার মুখের সলজ্জ স্মিতহাস্যের মতন তাকে অভ্যর্থনা করিতেছে; তার পকেটে মস্‌লার ছোট কৌটাটি সে শূন্য করিয়া যখনি বাড়ী ফিরুক, তার পরে বাহির হইবার সময় দেখে সেটি কখন্ তার অলক্ষ্যে পূর্ণ হইয়া আছে কার পরিপূর্ণ মমতায়; তার জুতায় পর্য্যন্ত আর ধুলা-কাদার একটু দাগও থাকিতে পায় না, কার সেবায় পাদুকা পর্য্যন্ত সদা সমুজ্জ্বল! নিরন্তর এই মমতার আবেষ্টনে শতবার শত পাকে জড়িত হইতে হইতে সনতের মন একটা কেমন পুলক-বেদনার মোহে আবিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল; তার উপর আবার পুঁটি যখন মলিনার সেবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়া শোনায় তখন সনতের

আনন্দ অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে, সে একেবারে কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সনতের মোটর পথে বিকল হইয়া অচল হওয়াতে সনৎ সেই পথটুকু হাঁটিয়াই বাসায় ফিরিল। সে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া একবার রান্নাঘরের দিকে চাহিল, কাকেও দেখিতে পাইল না; রান্নাঘরের ভিতর হইতে প্রাইমাস্ ষ্টোভ কোঁ কোঁ করিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, সনৎ বুঝিল মলিনা ও পুঁটি রন্ধনেই ব্যাপৃত আছে। সে উপরে উঠিয়া আসিয়া জাপানী পর্দ্দার আড়ালে গিয়া তার পোষাক ছাড়িতেছে, কার পায়ের শব্দ তার কানে গেল। সনৎ ডিঙি মারিয়া পর্দ্দার উপর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল মলিনা সিঁড়িতে উঠিতেছে; তার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে, অযত্নবদ্ধ চুলের রাশি তার সুন্দর মুখখানিকে বেড়িয়া ফাঁপিয়া ফুলিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, একাদশীর চাঁদের মতন তার কপালে আর পদ্মের পাপ্‌ড়ির মতন তার ঠোঁটদুখানির উপর মুক্তার মালার মতন বিন্দু বিন্দু ঘাম বিদ্যুতের আলোতে চকচক করিতেছে; সিঁড়ির ধাপে ধাপে উঠিয়া-আসার সঙ্গে সঙ্গে মলিনার মূর্ত্তি যতই তালে তালে ক্রমশঃ সনতের চোখের সাম্‌নে হিল্লোলিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল, সনতের মন আনন্দের আন্দোলনে ততই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মলিনা একখানি আধময়লা লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া আছে, তাতে হলুদের দাগ, হাঁড়ির কালি লাগিয়া আছে; সেই কর্ম্মচিহ্নলাঞ্ছিত বসনখানিতেই তাকে বড় ভালো মানাইয়াছিল। সনৎ তার পোষাক ছাড়া ভুলিয়া গিয়া ডিঙি মারিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

সনৎ যে বাড়ী ফিরিয়াছে তা মলিনা জানে না, ষ্টোভের ফোঁপানিতে সনতের পায়ের শব্দ সে শুনিতে পায় নাই। এখনি সনৎ আসিয়া-পড়িবে মনে করিয়াই রান্নার অবসরে সে তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সারিয়া-

লইতে আসিয়াছিল। ছড়ানো বই-কাগজগুলাকে ক্ষিপ্র হাতে সাজাইয়া মলিনা এলোমেলো কাপড়-জামাগুলা পাট করিয়া আন্‌লায় গুছাইয়া রাখিল; তার পর বিছানার চাদর তুলিয়া ঝাড়িয়া বিছানা পাতিতে লাগিল। এই ঘরের প্রত্যেক জিনিস যেন প্রাণবান অনুভবক্ষম, এরা যেন মলিনার যত্নের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, মলিনার আদর এরা যেন বুঝিতে পারে, এমনি ভাবে আগ্রহের সহিত মলিনা তাদের স্পর্শ করিতেছিল; ভক্ত পূজারী যেমন করিয়া দেবসেবার দ্রব্যের আয়োজন করে, একটু ত্রুটিতেই অপরাধ হইবার ভয়ে তার মন যেমন সদাই সচেতন ও সাবধান হইয়া থাকে, মলিনার মুখে তেমনি একটি ভক্তি-সন্নত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এখানকার সব জিনিস যেন অতি পবিত্র, এবং সেই শুচিতার সম্ভ্রম তার প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালনে মুখের ভাবে প্রকাশ পাইতেছিল। সনৎ বিছানায় বসিয়া বুট জোড়া খুলিয়া খাটের নীচেই রাখিয়া আসিয়াছিল, বিছানা করিতে করিতে মলিনার পা সেই জুতায় ঠেকিয়া গেল; দেবতার নির্ম্মাল্যে বা চরণামৃতের তাম্রকুণ্ডে পা ঠেকিয়া গেলে বিশ্বাসী ভক্তের মুখ অপরাধের আশঙ্কায় যেমন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে ও সর্ব্বশরীর ও মন যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়ে তেমনি ব্যস্ততার সহিত নত হইয়া মলিনা তাড়াতাড়ি সেই প্রকাণ্ড জুতা জোড়া তুলিয়া মাথায় ঠেকাইল, তারপর নিজের আঁচল দিয়া জুতার ধূলা মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিল। মলিনা বিছানা-পাতা সমাপ্ত করিয়া সেই বিছানার পায়ের দিকে মাটিতে হাঁটুগাড়িয়া উঁচু হইয়া বসিয়া বিছানার উপর তার কোমল গালটি পাতিয়া মাথাটি রাখিল; তারপর সেইখানে সে কপাল ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

মলিনা চলিয়া যাইতে যাইতে ঘরের মাঝখানে আসিয়া তার শিথিল

কবরী খুলিয়া বিপুল কেশভার এলাইয়া আবার জড়াইতে লাগিল, তাতে তার অঙ্গবাস ঈষৎ স্রস্ত হইয়া পড়িল। তখন যে সনতের দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া উচিত এ জ্ঞান তার ছিল না—সে আবিষ্টের মতন একই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তার শিরায় শিরায় রক্তকণার ঝুমঝুমি বাজিতেছিল।

হঠাৎ সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনিয়া মলিনা ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া সম্বৃত হইল। পরিতোষ উপরে উঠিয়াই সামনে মলিনাকে দেখিয়াই বলিল—এই যে বামুনঠাকরুন, সনৎ বুঝি আসে নি ?

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।" পরিতোষের পিছন হইতে পুঁটি বলিল—না, বাবু এখনো আসেনি।

পরিতোষ সিঁড়ির দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পুঁটির সাড়া পাইয়াই চট্ করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া বলিল—"একটু বসি তবে।" পরিতোষ লোলুপ দৃষ্টিতে মলিনার দিকে চাহিল।

মলিনা পথ পাইয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরিতোষ ইজি-চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া মলিনার উদ্দেশে বলিল—রাঘবকে একটু তামাক দিতে বোলো ত বামুন-দিদি।

উত্তরে পুঁটি বলিল—বল্‌ছি।

পরিতোষ দাতে দাঁত চাপিয়া বলিল—Devil take that old witch !

সনৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পর্দ্দার আড়ালে কাপড় ছাড়িতে লাগিল। অকালজলদোদয়ের ন্যায় এই অনভার্থিত আগন্তুকের অনধিকার প্রবেশে সনৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইল, তার আগমনে একটি সম্মোহন কবিতার ছন্দ যতি তাল ভঙ্গ হইয়া গেল। সনৎ আড়ালে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল, সে ঐ পশুটার সামনে বাহির হইতেও একটা

অকারণ কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, এবং সেই আড়ালে লুকাইয়াই বা কতকক্ষণ সে থাকিবে—ঐ হতভাগাটা ত শীঘ্র যাই-বার পাত্র নয়। অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সনৎ বাহির হইয়া আসিল।

পরিতোষ সনৎকে দেখিয়াই দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সোজা হইয়া বসিল, তার পর অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া ব্যঞ্জনার স্বরে বলিল—তুমি ঘরেই ছিলে? Sorry friend, I beg your pardon, বড় বেতালা সময়ে এসে পড়েছি। বেশ আছ বাবা! দিব্যি ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি, সোনার চশ্‌মা, সুন্দর চেহারা,—প্রচুর টাকা—বেশ আছ বাবা!

সনৎ পরিতোষের কথায় কোনো জবাব দেওয়া আবশ্যক বোধ না করিয়া মুখ হাত ধুইতে চলিয়া গেল। রাঘব আসিয়া পরিতোষকে তামাক দিয়া অল্পক্ষণের জন্য তার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

সনতের মনের মধ্যে যে বসন্ত-বাহার পরিপূর্ণ রাগিণীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল তারই মধুসঙ্গীত সে একাকী নির্জ্জনে উপভোগ করিবার অবসর পাইলে সুখী হইত, কিন্তু একি অনাহূত উপদ্রব। সনৎ মুখ ধুইতে-ধুইতে ঠিক করিল সে দুর্জ্জনকে পরিহার করিবার জন্য স্থানই পরিত্যাগ করিবে; গড়ের মাঠের এক কোণে গিয়া একাকী বসিয়া থাকিবে। মুখ ধুইয়া আসিয়া সনৎ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরি-তোষ বলিল—বেরুবে নাকি?

সনৎ শুধু বলিল—হুঁ।

—শিগ্‌গির ফির্‌বে?

—না, ঐ দিক দিয়েই বাড়ী চোলে যাব।

রাঘব পরিতোষকে তামাক দিয়া নীচে গিয়া পুঁটিকে বলিল—ঝিমা, বাবু কখন এল?

পুঁটি বলিল—তা ত জানি না ; মোটর-গাড়ীরও শব্দ পাইনি, জুতোরও শব্দ পাইনি। মলিনা, তুই দেখেছিলি কি ?

মলিনা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

পুঁটি বলিল—যে জলখাবার আছে, তাই দুখানা রেকাবিতে ভাগ কর্ না, নইলে ঐ চোখজ্বালানেটা বাবুকে খেতে দেবে না।

মলিনার মনের মধ্যে কেমন একটা বিরক্তির সঞ্চার হইল, তার এত যত্নে প্রস্তুত খাবার তাকেই লইয়া গিয়া পরিতোষকে দিতে হইবে !

সনৎ বাহির হইয়া যাইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষও চলিয়াছিল, পুঁটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—জল খাবেন না ?

সনৎ কেবল বলিল—না। রাত্রেও খাব না, আমি বাড়ী যাচ্ছি।

পরিতোষ খপ করিয়া সনতের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—একটু দাঁড়া। প্রস্তুত খাদ্য মুখে যাবার উমেদারী কর্‌ছে, তাকে প্রত্যাখ্যান ! জানিস্ উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান কোরে অর্জ্জুনের কি দুর্গতি হয়েছিল ! তুই বামুন হয়ে শাস্তর জানিস্‌নে ! ঝি, খাবারটা আন্‌তে বলো ত বামুন-দিদিকে, তোমাদের বাবু নেহাৎ বে-রসিক, আমি সুখাদ্যের সম্মান সর্ব্বদা কোরে থাকি !

সনৎ পরিতোষের অভদ্র কথায় বিরক্ত হইয়া রুষ্ট স্বরে বলিল—জলখাবারটা তুমিই এনে দাও পুঁটি-মাসী, বাজারের খাবার যখন আমরা খাই তখন তোমার ছোঁয়াও খেতে পারি।

পরিতোষ রোষকে হাসিতে প্রকাশ করিয়া বলিল—কেন, তোমার বামুন-ঠাক্‌রুণ পর্দ্দানশীন হয়ে উঠ্‌ছেন নাকি ?

পুঁটি ও রাঘব দুজনে দুজনের জলখাবার ও জলের গেলাস লইয়া আসিল ; সনৎ ও পরিতোষ সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া নীরবে সেসব খাইল। আজকার খাওয়ায় সনৎ ও পরিতোষ কেউই আনন্দ অনুভব

করিল না—উভয়েই মনে মনে তার জন্য অপরকে দায়ী করিয়া বিরক্ত হইতেছিল।

সনৎ পরিতোষের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া ট্রামে ট্রামে গোটা কলিকাতা পরিক্রমণ করিয়া নটা রাত্রির সময় বাসায় ফিরিয়া আসিল—আজ তার মনের মধ্যে যে একটি নূতন আনন্দের নহবৎ বসিয়াছে তার রাগিণী নিরুপদ্রবে উপভোগ করিবার জন্য সে বসাতেই ফিরিয়া আসিল, বাড়ী যাইতে তার মন সরিল না। কিন্তু বাসায় ফিরিয়া আসিয়া তার মনে হইল সুবাসিনী হয়ত তার পথ চাহিয়া সমস্ত রাত বসিয়া থাকিবে। সেই বেদনার সঙ্কোচ দূর করিবার জন্য সে রাঘবকে বলিল—আমার মোটর-গাড়ীর শফারকে বল্ গিয়ে আমার বাড়ীতে বোলে আসুক আজ রাত্রে আমি যেতে পার্‌ব না।

ইহা শুনিয়া পুঁটি বলিল—আপনি বাড়ী যাবেন বোলে ত খাবার তৈরি করা হয়নি।

সনৎ বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বলিল—আমার খাবারের আর দর্‌কার নেই মাসী।

পুঁটি নীচে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—তা কি হয় বাবা? এখুনি লুচি ভেজে নিয়ে আস্‌ছি।

নিষেধ নিষ্ফল জানিয়া সনৎ চুপ করিয়া রহিল। নীচে রান্নাঘরে ষ্টোভটা ফোঁ ফোঁ করিয়া গর্জ্জন সুরু করিল।

মলিনা খাবারের থালা লইয়া উপরে উঠিতেছে, আবার পরিতোষ আসিয়া উপস্থিত। সে মলিনার সঙ্গে-সঙ্গে উপরে উঠিতে উঠিতে এক মুখ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—অন্নপূর্ণা কোন্ ভিখারী শিবকে ভাগ্যবান কর্‌তে চলেছেন?

মলিনা পিছন ফিরিয়া না তাকাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল।

পরিতোষ এক এক সিঁড়ি ডিঙাইয়া মলিনার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে ঢুকিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। খাবারের ঠাঁই করিয়া দিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে পুঁটি, আর বিছানার উপর উঠিয়া বসিল সনৎ। পরিতোষ ভয় বা লজ্জা পাইবার পাত্র নয়; সে পুঁটির রূঢ় দৃষ্টি ও সনতের বিরক্তি অগ্রাহ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—Sorry friend, again an intruder! পৃথিবীটা গোল বোলে বড়ই গণ্ডগোলে পড়েছ দেখ্‌ছি! সাল্‌থে যাবার জন্যে বেরিয়ে এসে-পড়্‌লে কিনা সান্‌কিভাঙ্গার গলিতে! তোমার কপাল-জোর—অম্‌নি লুচি প্রস্তুত। আর আমি বাসায় গিয়ে বাজার থেকে খাবার কিনে খাব, তাও মনিব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছিনে। তাই দেখ্‌তে এলাম এখানে সেটা পোড়ে আছে কি না।

মলিনা আসনের সাম্‌নে থালা রাখিয়া নীচে নামিয়া গেছে; পুঁটি ও সনৎ যেমন ছিল তেমনি নির্ব্বাক। পরিতোষ একবার ইজিচেয়ারের আশে-পাশে হেঁট হইয়া উঁকি মারিয়া বলিল—নাঃ! সেটা আর-কোথায় পড়েছে বা কেউ বেমালুম সরিয়ে নিয়েছে বোধ হয়। পেটে জলন্ত খিদে, সাম্‌নে গরম খাবার, আসনে বোসে পড়্‌বার লোভটা খুবই প্রবল; কিন্তু একই দিনে বার বার ভাগ বসানোটা সঙ্গত হবে না। যাই, পানওলার কাছে ধারে একটা লেমনেড খেয়ে পোড়ে থাকিগে......

পরিতোষ সনতের দিকে চাহিয়া হাসিল। সনৎ চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। সনতের সাড়া না পাইয়া হঠাৎ পরিতোষ তরতর করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে পুঁটিও সরিয়া আসিয়া সিঁড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইল। পরিতোষ একবার পিছন ফিরিয়াই দেখিল তার মাথার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্যই যেন উদ্যত হইয়া আছে পুঁটির সতর্ক মূর্ত্তি! পরিতোষ অমনি ছিট্‌কিয়া গিয়া একেবারে রাস্তায় পড়িল।

পুঁটি সনৎকে ডাকিল—বাবু, খেতে বসুন, লুচি কখানা জুড়িয়ে গেল। সনৎ আস্তে আস্তে আসিয়া আসনে বসিল।

(৯)

পরদিন পরিতোষ সনতের বাসায় আসিয়াই বলিয়া উঠিল—এ তুমি ভাল কর্‌ছ না, সনৎ।

সনৎ তার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ তুলিয়া পরিতোষের দিকে তাকাইল।

পরিতোষ জোর দিয়া বলিল—এতে তোমার দুর্নাম রট্‌ছে।

সনৎ শান্ত স্বরে বলিল—রটুক।

—তাতে তোমার পসার যে একদম মাটি হবে!

—হোক।

—তোমার স্ত্রী তোমাকে কি বল্‌বেন?

—সে ভাবনা শুধু আমার।

—তোমার স্ত্রী যদি জান্‌তে পারেন যে তুমি একটা রাঁধুনী......

—তিনি জানেন।

—তিনি ত জানেন রাঁধুনী আছে; কিন্তু এও জানেন কি যে সেই রাঁধুনীর বয়স কত, দেখ্‌তে কেমন, আর তিনি চির-এয়ো—হাতে চুড়ি, পেড়ে শাড়ী পোড়ে ফিটফাট—কিন্তু তার সোয়ামীর সন্ধান নেই!

সনৎ এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। সুবাসিনীর নিকটে সে ত মলিনার কথা বাস্তবিকই গোপন করিয়া রাখিয়াছে। কেন? তার মনে তবে নিশ্চয় একটা প্রচ্ছন্ন ভয় ছিল যে সুন্দরী তরুণীকে লইয়া বাসায় থাকিলে তার স্ত্রীর মনে কিছু সন্দেহ ও ঈর্ষা জন্মিতে পারে। এ কথা ত সে এতদিন তলাইয়া ভাবে নাই, আজ পরিতোষ তাকে সচেতন করিয়া দিল। সনতের মুখ চিন্তাকুল হইয়া উঠিল।

পরিতোষ সনৎকে চিন্তাকুল ও নিরুত্তর দেখিয়া খুসী হইয়া পরাভূত প্রতিপক্ষকে আর-একবার অস্ত্রাঘাতের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াও বাহ্যিক গম্ভীর ভাবে বলিল—যে কথা আগে গোপন রেখেছ, সেই কথা পরে তিনি টের পেলে তিনি কি ভাব্‌বেন?

সনৎ নিরুত্তর। তার মনে পড়িল সুবাসিনী একদিন সনৎকে খাইতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'তোমার বাসার বাম্‌নী কেমন রাঁধে?' তার উত্তর দিতে সনতের গলায় খাবার আট্‌কাইয়া গিয়াছিল, সে কোনোমতে ঢোক গিলিয়া বলিয়াছিল—'ঐ একরকম, ভালোও নয়, মন্দও নয়।' সেই দিন থেকে সুবাসিনী নানাবিধ খাবার তৈরি করিয়া সকালে সনতের চলিয়া আসার সময় সঙ্গে ছায়। এর পর রাঁধুনীকে লইয়া কোনো প্রশ্নই তাদের মধ্যে ওঠে নাই; সনৎ যেন ঐ প্রশ্নটার আবার উত্থাপন হওয়ার সম্ভাবনাকেও একটু ভয়-ভয় করিত।

পরিতোষ পরম হিতৈষীর ন্যায় মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিল—তাই বল্‌ছিলাম, ও-বাম্‌নীকে তোমার রাখা উচিত নয়; ওরও উচিত নয় তোমার মতন বাসাড়ের কাছে একলা থাকা। গেরস্ত-বাড়ীতে যেখানে দু-পাঁচজন বৌ ঝি আছে, তেমন বাড়ীতে থাকা ভালো! আমার বোন একজন ভালো ভদ্রলোকের মেয়ে রাঁধুনী খুঁজ্‌ছে। যদি তোমরা রাজি হও ত আমায় শিগ্‌গির বলো।

সনৎ চুপ করিয়া অন্য দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। তার নিজের মনের মধ্যে পলে পলে তিলে তিলে যে অনুরাগ অজ্ঞাতসারে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, তাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল কাল সন্ধ্যায় মলিনার অনুরাগের ঈষৎ পরিচয় এবং তাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল পরিতোষের আজকার কথা। মলিনার সহিত বিচ্ছেদের প্রস্তাব মাত্রেই তার অন্তরে যেরূপ বেদনা বাজিল, তার স্ত্রীর প্রতি যেরূপ ভয় বাড়িল, তাতেই সে বুঝিতে

পারিল মলিনা তার অন্তরের কোন্ নিগূঢ়তম কোণটিতে আস্তে আস্তে একটির পর একটি তুচ্ছ তৃণ রাখিয়া রাখিয়া একটি পরম সুখকর নীড় রচনা করিয়া বসিয়াছে। এই ভীরু পাখীটিকে তার বাসা ভাঙিয়া নিরাশ্রয় করিয়া কূলহীন সীমাহারা শূন্য আকাশে বর্ষা বাদল ঝড় ঝাপ্‌টা অদিন দুর্দ্দিনের মধ্যে অসহায় ছাড়িয়া দিতে সনতের অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; তাহা যে বর্ব্বর নিষ্ঠুরতা, তাহা যে হৃদয়হীন ব্যাধবৃত্তি!

পরিতোষ দুরূহ সমস্যার জটিল চিন্তার বিষ সনতের অন্তরে ইন্‌জেক্‌ট্ করিয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল। মনে মনে সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, রাস্তায় নামিয়া তাহার পা-জোড়া চলিতে চলিতে নাচিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। সে যেমন জোর গলায় চেঁচাইয়া কথাগুলা বলিয়াছে তাতে মলিনারও শুনিতে বাকি নাই, সে ত উপর হইতে নামিবার সময় দেখিল—তাকে নামিতে দেখিয়া মলিনা ও পুঁটি সিঁড়ির নীচে হইতে আড়ালে সরিয়া গেল!

পরিতোষ চলিয়া গেলে মলিনা কোনোমতে কান্না চাপিয়া বলিল—মাসী, বাবুর যাতে ক্ষতি হয় তা ত আমাদের করা উচিত নয়।

পুঁটি গলায় জোর দিয়া বলিল—নিশ্চয় নয়। আমি অন্যত্র কাজ খুঁজ্‌ব কাল থেকে।

মলিনা বর্ষার দিনের ভিজে হাওয়ার মতন আর্দ্র স্বরে বলিল—কিন্তু ঐ পরিতোষের কারো বাড়ীতে নয় মাসী।

পুঁটি শুষ্ক স্বরে বলিল—সে তোকে বল্‌তে হবে না, মা।

রাত্রে নিজেদের ঘরে শুইতে গিয়া মলিনা বলিল—মাসী, কাল আমায় একজোড়া থান কাপড় কিনে এনে দিস; আর এই পেতলের চুড়ি কগাছা খুলে ফেল্‌তে দে......

পুঁটি বলিল—না মা, তা ত কর্‌বার জো নেই ; তোর মার যে নিষেধ আছে।

—যার সোয়ামীর উদ্দেশ নেই সে যদি সধবার বেশ পোরে থাকে তবে লোকে তাকে মন্দ ত বল্‌বেই।

—বারো বছর না গেলে ত মৃত্যু মনে কর্‌তে নেই। আরো তিন বচ্ছর যাক্ ; তার পর যা হয় করিস্!—পুঁটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মলিনা বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল তার মাকে, আর ভাবিতে লাগিল আপনার অদৃষ্টের কথা। অতি শৈশবে তার বিবাহ হইয়াছিল ; সেই বিবাহের সময় সে একবার মাত্র তার স্বামীকে দেখিয়াছিল ; তার পর একদিন তার মা রূঢ় ভাবে তাকে শোনাইয়া দিলেন তার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যাকে সে চিনিত না, তার অদর্শনে তার দুঃখও হয় নাই ; কেবল একটা কি অনাস্বাদিত সৌভাগ্য হইতে সে বঞ্চিত হইল এই লোকপরম্পরা-আগত একটা সংস্কারে তার মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল মাত্র। তার পর জ্ঞান হইয়া যে একটি মাত্র পুরুষকে সে চিনিল ও ক্রমে কৃতজ্ঞতা হইতে তাকে মুগ্ধ হৃদয়ের ভক্তি দিতে দিতে অবশেষে ভালবাসা দিয়া অন্তরে গোপনে পরমাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তাকেও এখন ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আজ সে অনুভব করিতে লাগিল বৈধব্যের শূন্যতা কী ভয়ানক, কত ক্লেশকর। ঐ পরিতোষটা তার দুর্গ্রহের মতন কেন আসিয়া তার স্বপ্নজাল এমন করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া গেল! সে বন্ধুকে দুর্নাম হইতে, পারিবারিক অপযশ হইতে, দাম্পত্য বিচ্ছেদ হইতে বাঁচাইবার জন্য যাহা বলিয়াছে, তাতে যে তার জীবনের একটি মাত্র সুখ নষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে। মলিনা যদি পরিতোষের কথা না শুনিতে পাইত

ত বেশ হইত। কিন্তু সনৎ যদি তাদের বিদায় করিয়া দিতে চায় তবে সে যে কঠিন আঘাত! তার চেয়ে সেই কঠিন আঘাত পাইবার আগেই মলিনারা স্বেচ্ছায় তার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাইবে। এই ভালো, ওগো এই ভালো, এ ছাড়া যে আর পথ নাই।

সনতের সম্পর্ক ত্যাগ করাই যখন অনিবার্য্য প্রতিপন্ন হইয়া গেল তখন মলিনার চোখ দিয়া অশ্রুস্রোত বেগে প্রবাহিত হইয়া নিঃশব্দে তার বালিস ভিজাইতে লাগিল।

(১০)

পরদিন বড় ভারাক্রান্ত মন লইয়া সনৎ ও মলিনা উভয়েই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল। যেন নিখিল অশ্রুসাগর আজ মলিনার চোখের স্বচ্ছ তারায় নিজের মুখের ছায়া ফেলিয়াছে, আর সনতের মন যেন ক্ষান্তবর্ষণ শ্রাবণ-রজনীর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে। সনৎ পোষাক পরিয়া হাসপাতালে যাইবার জন্য নীচে নামিয়া ডাকিল—পুঁটি-মাসী।

মলিনা রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল—মাসী একটু কাজে বেরিয়েছে।

আজ এই তৃতীয় দিন মলিনা সনতের সঙ্গে কথা বলিল; আজ কথা বলিতে মলিনার গলা কাঁপিয়া গেল, প্রত্যেকটি কথা যেন অশ্রুসাগর হইতে সদ্য স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে—তাদের প্রত্যেক ধ্বনিতে অশ্রুবিন্দু ক্ষরিত হইয়া পড়িতেছে!

সনৎ একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া চেষ্টা করিয়া হাসিয়া বলিল—আজ আমি পুরী যাচ্ছি মলিনা; ফিরতে আট-দশ দিন দেরী হবে। এই ক'দিন তুমি একটু জিরিয়ে নিতে পারবে—এ কদিন আমি আর প্রভুত্ব কোরে তোমাদের বিরক্ত করব না।

এই আসন্ন ছুটি কি সম্পূর্ণ বিচ্ছেদেরই পূর্ব্বসূচনা! দাসত্ব-মুক্তির

মুখোস পরিয়া একি বিদায়-সম্ভাষণ! মলিনার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে মাথা নত করিল। মলিনার বিষণ্ণতায় সনতের মুখের চেষ্টা-করিয়া-ডাকিয়া-আনা হাসি মিলাইয়া গেল, সেও চট করিয়া ফিরিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে ভারি গলায় বলিয়া গেল—পুঁটি-মাসী এলে তাকেও বোলো মলিনা।

মলিনা রান্নাঘরে গিয়া দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া পড়িল ও দুই হাতে আঁচল ধরিয়া মুখে চাপা দিয়া উচ্ছ্বসিত কান্না রোধ করিবার চেষ্টায় আরো বেশী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মলিনা অনুভব করিল কার সান্ত্বনা নীরবে তার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইতেছে। প্রথমে সে মনে করিল সেই স্পর্শ পুঁটির; তারপর মনে হইল সনতের। মলিনার নিরুদ্ধ বেদনা ঝরণায় বান আসার মতন অজস্র কান্নায় ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই স্পর্শে সান্ত্বনার সঙ্গে লালসার ব্যগ্রতা সে অনুভব করিয়া বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতন চট করিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল—সে পরিতোষ! পরিতোষ একেবারে তার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া তার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তার হাত চাপিয়া ধরিয়াছে! মলিনা তার কলুষিত স্পর্শ হইতে মুক্ত হইবার জন্য এক ঝট্‌কায় তাকে সরাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর ঘরের এক টেরে গিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাকাইয়া বলিল—আপনি যান এখান থেকে।

পরিতোষ বিনয়ের সহিত বলিল—তোমায় দেখে অবধি আমি ভালোবেসেছি মলিনা, তুমি কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। তুমি আমার বাড়ীতে চলো, আমি তোমায় রাণী কোরে রাখ্‌ব—সনতের মতন সোনার প্রতিমাকে দিয়ে ভাত রাঁধাব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি অমন কোরে তাকিয়ো না, একটু ভেবে দেখো......

মলিনা তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিল—রাঘব!

সাবধানী পরিতোষ রাঘবকে সিগারেট কিনিতে দোকানে পাঠাইয়া তবে আসিয়াছিল।

মলিনা রাঘবের কোনো সাড়া না পাইয়া ভয় দমন করিয়া সহজ ভাবে বলিল—আপনি যান।

—তুমি আমার বাড়ীতে যাবে স্বীকার করো। সনতের কাছে তুমি কোন্ সুখে পোড়ে রয়েছ······

মলিনা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে কেবল ডাকিতে লাগিল—মধুসূদন রক্ষা করো! মা দুর্গা রক্ষা করো!

মলিনা আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া যেখানে বঁটিখানা কাত হইয়া পড়িয়া ছিল সেখানে গিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

পরিতোষ আবার জিজ্ঞাসা করিল—কি বল্‌ছ মলিনা?

মলিনা নীরব।

পুঁটির গলা শোনা গেল, সে বকিতে বকিতে বাড়ী ঢুকিতেছে—এতখানি বেলা হয়ে গেল, রাঘব দরজা বন্ধ কোরে আবার কোথায় হাওয়া খেতে গেল, কখনই বা বাজার কর্‌বে, আর কখনই বা রান্না হবে।

পুঁটির কথা শুনিয়াই পরিতোষ তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে পুঁটি-মাসী, তোমাকে খুঁজ্‌তেই রান্নাঘরে যাচ্ছিলাম,—একটা বেশ ভালো কাজ আছে মাসী, কর্‌বে?

পুঁটি তার দিকে একবার কটমট করিয়া চাহিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে শুধু বলিয়া গেল—না।

পরিতোষ রাঘবের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা না করিয়া সিগারেটের মায়া ত্যাগ করিয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গেল—রাস্তায় পড়িয়া দাঁতের উপর দাঁত রাখিয়া বলিয়া উঠিল—ডালকুত্তা মাগী!······

(১১)

সনৎ একেবারে নিজের সাল্‌খের বাড়ীতে গিয়াই সুবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই হঠাৎ বলিয়া উঠিল—চলো আজ আমরা পুরী যাই—এখান থেকে কিছু দিন পালাই চলো, এখানে থেকে আমি পলে পলে তোমা থেকে দূর হয়ে যাচ্ছি ; সেখানে নিরিবিলিতে আবার আমরা দুজনে দুজনের হব।

সুহাসিনী তার অতিসুন্দর সরলতা-মাখা মুখখানি তুলিয়া গভীর-প্রণয়ভরা দৃষ্টি দিয়া স্বামীর-মুখ দেখিয়াই বুঝিল তার অন্তরে কিসের একটি গুরু বেদনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সরলা সুহাসিনী মনে করিল তার ডাক্তার স্বামী পসারের অত্যাচারে এতদিন তাকে যে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে তারই বেদনা এ। সে খুসী হইয়া স্বামীর কাঁধের উপর দুই হাতের আঙুল শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়া বলিল—আজই যাবে? তা চলো, খেটে খেটে তোমার শরীর মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, দু দিন একটু জিরিয়ে নেবে।

সনৎ বুঝিতে পারিতেছিল যে সে পলে পলে তিলে তিলে মলিনার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজের প্রেমময়ী পত্নীর প্রতি অন্যায় অবিচার করিতেছে ; যে তার জীবনের আনন্দ ছিল, সে এখন ক্রমশঃ পর হইয়া দূর হইয়া ত যাইতেছেই, অধিকন্তু তার প্রতি কেমন একটা বিরাগ ও অসন্তোষ সমস্ত মন জুড়িয়া বসিতেছে। তাই সনৎ মনে করিয়াছিল মলিনার নিকট হইতে পালাইয়া সুবাসিনীর সঙ্গে একান্তে বাস করিয়া আবার তার নষ্টপ্রায় প্রণয়কে সঞ্জীবিত করিয়া লইবে। কিন্তু তার মনের কোনো এক অন্তরাল কোণে বোধ হয় এই ইচ্ছাটুকু গোপনে লুকাইয়া ছিল যে সুবাসিনী তার ঘরকন্না ফেলিয়া এত অল্পক্ষণের খবরে বিদেশে যাইতে সম্মত হইবে না, সে হয়ত পাঁজি খুলিয়া দক্ষিণে যাত্রার

শুভ যোগ সন্ধান করিতে বসিবে; এবং তখন সে তার মনকে এই সান্ত্বনা দিতে পারিবে যে সে ত সুবাসিনীকে লইয়া মলিনার নিকট হইতে পালাইতে চাহিয়াছিল, সুবাসিনীই ত যাইতে স্বায় নাই, অতএব দোষ কি তার? কিন্তু এখন তার সেই আকাঙ্ক্ষা ও আন্দাজকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া সুবাসিনী তৎক্ষণাৎ বিদেশে যাইতে সম্মত হওয়াতে সনতের মনটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, মলিনাকে ছাড়িয়া সত্যসত্যই দূরে গিয়া কয়েক দিনও থাকা যে কত কঠিন ও কত ভয়ানক তাহা তার মনের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। তখন সনৎ আর স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, মাথা নত করিয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে বলিল—কিন্তু আজকে দক্ষিণে যাত্রা আছে ত?

মোটরের উড়ো হাওয়ায় সনতের উস্কোখুস্কো চুলগুলি সুবিন্যস্ত করিয়া দিতে দিতে সুবাসিনী বলিল—তবে আজ থাক, পাঁজি দেখে পরে একদিন গেলেই হবে।

যে সনৎ চিরকাল সুবাসিনীর পাঁজির উপর নির্ভর ও বিশ্বাসকে কঠিন ঠাট্টা করিয়া আসিয়াছে, সেই সনৎ আজ পাঁজির অনুমতির কথা তুলিয়া মনে মনে অপ্রস্তুত হইতেছিল; তাই সে মনে মনে প্রস্তুত হইতে-ছিল যে, সুবাসিনী যখন তাকে পাল্টা ঠাট্টা করিবে তখন সে কি উত্তর দিবে।—সে বলিবে, আমি ত মানিই না, তুমি মানো কিনা তাই। কিন্তু তার সমস্ত অনুমানই আজ বারবার ফাঁসিয়া যাইতেছে; সুবাসিনী উচ্ছ্বসিত হাসিতে তাকে অপ্রতিভ করিয়া না দিয়া বিষণ্ণ সান্ত্বনার মৃদুস্বরে বলিল—তবে আজ থাক, পাঁজি দেখে পরে একদিন গেলেই হবে।

সনৎ পত্নীর এই অপ্রকাশ সান্ত্বনা দিবার চেষ্টায় তারই মতে বিনা আপত্তিতে মত দেওয়া দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল—তুমি যদি

পাঁজি না মানো ত আমার কি? আজই চলো তবে। ঠিক হয়ে থেকো কিন্তু, রাত আটটায় গাড়ী, আমি সাতটার সময় আস্‌ব......

সনৎ পত্নীর দিকে আর না তাকাইয়া ফিরিয়া চলিল। সুবাসিনী পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে বলিল—এখনি আবার কল্‌কাতা চল্‌লে? কিছু খেয়ে যাবে না?

সনৎ না ফিরিয়াই বলিল—না, সব ব্যবস্থা কোরে নিতে হবে ত। হঠাৎ অমনি বিদেশে যাব বল্‌লেই ত হল না।

যেন সুবাসিনীই হঠাৎ বিদেশে যাইবার প্রস্তাব করিয়া অপরাধী এমনি বিরক্ত ভাবে সনৎ কথা কয়টা বলিয়া গেল। সুবাসিনীর মুখ স্বামীর অপ্রকাশ বেদনায় কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু সনৎ সে দিকে ফিরিয়া না তাকাইয়া মোটরে গিয়া চড়িল। মোটর ঝর্‌র্‌র্ শব্দ করিয়া শিঙা বাজাইয়া ধুলা উড়াইয়া নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল; সুবাসিনী অদৃশ্য মোটরের ধূলিধূমকেতুর দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তার মনে হইল তার স্বামীও যেন অমনি একটা ধূলিধূমের আবরণে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ তার কাছে অস্পষ্ট হইয়া বেগে দূরে দুরান্তে সরিয়া যাইতেছে।

সনৎ বাসায় আসিয়াই ডাকিল—পুঁটি-মাসী, মলিনাকে বলো আমার একটা ব্যাগে আমার জিনিসপত্তরগুলো একটু গুছিয়ে রাখ্‌বে, আমি ত গুছিয়ে নেবার সময় পাবো না।

পুঁটি সনতের নিকটে আসিয়া বলিল—আপনি চোলে যাচ্ছ, কিন্তু আমরাও যে যাব বাবা।

সনৎ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথায়?

পুঁটি মাথা নীচু করিয়া আস্তে বলিল—পটলডাঙায়, দিনাজপুরের রাণী তির্থি কর্‌তে বেরিয়েছেন, তাঁর কাছেই থাক্‌ব, ইহপরকাল দুইএরই কাজ হবে।

সনৎ একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা উঁচু করিয়া বলিল—বেশ! আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত যদি থাকা অসুবিধে হয় রাঘবকে চাবিছোড়ান দিয়ে যেয়ো।

এই কথা শুনিয়া মলিনার বুকের মধ্যে কান্নার ঝড় তুফান তুলিয়া তাকে পাগল করিয়া দিল। সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়া সনতের উত্তর শুনিবার প্রতীক্ষায় দরজার আড়ালে আগাইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; সে মনে করিয়াছিল তাদের যাওয়ার কথা শুনিয়া সনৎ কত দুঃখ প্রকাশ করিবে, কত ওজর আপত্তি তুলিবে, কত অনুনয় উপরোধ করিয়া তারই কাছে থাকিতে বলিবে। কিন্তু এ কী মোহ তার রূঢ় কঠিন আঘাতে ছিন্ন বিদীর্ণ হইয়া গেল! সনৎ স্বচ্ছন্দে বলিল কিনা—"বেশ! আমি ফিরে আসা পর্য্যন্ত যদি থাকা অসুবিধা হয় রাঘবকে চাবিছোড়ান দিয়ে যেয়ো!"

পুঁটি ডাকিল—মলিনা, বাবুর বাক্‌স গুছিয়ে দিগে বাবু থাক্‌তে-থাক্‌তে, কি চাই না-চাই বাবু দেখে নেবেন।

মলিনা কান্নার ঝড় বুকে চাপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সনতের সাম্‌নে দিয়া উপরে চলিয়া গেল। সনৎও ম্লান মুখে সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিল—পুঁটিও আসিল।

সনৎ আসিয়া খাটের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিল। পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—কি কি সঙ্গে নেবেন বাবা?

সনৎ তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল—দিন দশ-পনেরোর মতন যা হয় কিছু দিয়ে দাও। আমার কি দর্‌কার এই তিন মাস ত আমি ভাবিনি; এর পরে ভাবব।

সনতের এই কথায় পুঁটি গম্ভীর হইয়া গেল; মলিনার চোখের জল ধরিয়া রাখিবার কঠিন চেষ্টায় বুক ফাটিয়া যাইবার মতন টন-টন

করিতে লাগিল। সে রৌদ্রদগ্ধ ফুলের মতন মুখখানি নত করিয়া ব্যাগের মধ্যে জিনিস গুছাইতে লাগিল।

একটুক্ষণ পরে নীচে হইতে রাঘব ডাকিল—ঝিমা, একটু তেল দিয়ে যাও না।

"যাই"—বলিয়া পুঁটি নীচে নামিয়া গেল। পুঁটি চলিয়া যাইতেই সনৎ ক্লান্ত বিষণ্ণ স্বরে ধীরে বলিল—এত তাড়াতাড়ি চোলে যাবে মলিনা?

এই সামান্য প্রশ্নের স্বরভঙ্গীর মধ্যে সনতের মনের যে বেদনা প্রকাশ পাইল তাতে মলিনার সকল আক্ষেপ দূর হইয়া গেল, এখন স্থির থাকা দুষ্কর হইয়া উঠিল; সে ঠোঁট কামড়াইয়া নিজের উচ্ছ্বসিত কান্না সম্বরণ করিয়া লইয়া অতি মৃদু স্বরে বলিল—"সাম্‌নে পোষ মাস আস্‌ছে।" কথা কয়টা বলিতে তার কণ্ঠ বড় কাঁপিয়া উঠিল।

সনৎ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—আমাকে ছেড়ে তুমি যেতে পার্‌বে?

মলিনা আর আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারিল না, দুই চোখ দিয়া বড় বড় ফোঁটায় অশ্রুর বৃষ্টি টপ টপ করিয়া নামিয়া পড়িল; যে দারুণ দুঃখের মেঘ তার অন্তর ও বাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া জড়াইয়া ছিল তাহা সনতের কথার স্নিগ্ধ শীতল স্পর্শ পাইয়া একেবারে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল বাক্সর ভিতর পড়িতেই মলিনা তাড়াতাড়ি হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া একটা আল্‌মারীর খোলা দুই পাট কপাটের আড়ালে গিয়া লুকাইয়া দাঁড়াইল।

প্রশ্নটা করিয়া ফেলিয়া সনৎ অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করিতেছিল, সেও উঠিয়া গিয়া রাস্তার ধারের বারান্দায় পায়চারি করিতে লাগিল।

পুঁটি আসিয়া আবার পাহারায় দাঁড়াইয়া বলিল—শিগ্‌গির কোরে নে মলিনা, বাবাকে খেতে দিবি।

মলিনা চোখের জল মুছিয়া আবার মনকে কঠিন জমাট আড়ষ্ট করিয়া কাজ সমাধা করিতে নিযুক্ত হইল।

পথ দিয়া একখানা খালি ট্যাক্সি গাড়ী যাইতেছিল; সনৎ ডাকিয়া দাড় করাইল। পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল—এখন না খেয়ে দুপুর বেলা কোথায় যাবে বাবা?

সনৎ ঘরে আসিয়া বলিল—এখনি ফিরে আসছি। আমায় একটু সরবৎ কোরে দিতে পারো মাসা?

"আনি বাবা"—বলিয়া পুঁটি নীচে নামিয়া গেল। অমনি সনৎ মলিনার কাছে সরিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি চুপি-চুপি বলিল—মলিনা, চট কোরে তোমার হাতের একগাছা চুড়ি খুলে দাও ত।

মলিনা আশ্চর্য্য হইয়া ঘাড় ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সনতের দিকে চাহিল।

সনৎ বলিল—আমার দরকার আছে, চট কোরে খুলে দাও।

মলিনা একগাছা চুড়ি খুলিয়া সনতের দিকে আগাইয়া ধরিল। সনৎ টপ করিয়া লইয়া সেটা জামার পকেটে ফেলিয়া সরিয়া গেল। পুঁটি চিনির পানা ও নেবু কাটিয়া লইয়া উপরে আসিল। সনৎ সরবতে নেবু গালিয়া এক নিশ্বাসে গ্লাস খালি করিয়া নীচে চলিয়া গেল। ট্যাক্সিতে চড়িয়া বলিল—রাধাবাজার চলো।

সনৎ চলিয়া গেলে মলিনা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল; এক বুক দুঃখ চাপিয়া সনতের কাছে আপনাকে সম্বরণ করিয়া রাখা তার অত্যন্ত কঠিন বোধ হইতেছিল। তার উপর আবার সনৎ তার হাতের চুড়ি চাহিয়া লইয়া তার বিক্ষুব্ধ মনকে আরো উতলা ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

ঘণ্টা খানেক পরে সনৎ কয়েকটা কাগজ-মোড়া প্যাকেট লইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল। মলিনা মনে করিল সনতের সঙ্গে লইবার

জিনিস বোধহয়; সে কাগজ খুলিয়া বাক্সে সাজাইয়া দিবে বলিয়া সেগুলিতে হাত দিতেই সনৎ বলিল—ওসব থাক, ও তুল্‌তে হবে না।

সমস্ত দিন সনৎ কোথাও বাহির হইল না। বিকাল বেলা পুঁটি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—সন্ধ্যাবেলা এখান থেকে খেয়ে যাবেন কি?

সনৎ হাসিয়া কথাটাকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, মলিনার হাতের শেষ খাওয়া খেয়ে নি।

পুঁটি কিন্তু সনতের সেই হাসির মিথ্যা ছলনায় ভুলিল না, তার দুই চোখে জল ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার সময় মোটরে বাক্স ব্যাগ চাপানো হইয়াছে; সনৎ দুপুর বেলা যে-সব জিনিস কিনিয়া আনিয়াছিল সেইগুলি হাতে করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। রাঘব হাত বাড়াইয়া সনতের হাত হইতে পুঁটুলিগুলি লইতে গেলে সনৎ বলিল—থাক।

সনৎ নীচে নামিয়া আসিয়া মলিনা বা পুঁটি কাউকেই দেখিতে না পাইয়া ডাকিল—মাসী, আমি যাচ্ছি তবে।

পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া সনৎকে গড় হইয়া প্রণাম করিল; তার পিছনে পিছনে মলিনাও সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া আসিয়া সনৎকে প্রণাম করিল। সনৎ অবনত হইয়া মলিনার ভূলুণ্ঠিত মাথার উপর হাত রাখিয়া সেই স্পর্শের ভিতর দিয়া প্রাণের প্রচ্ছন্ন বেদনাভরা প্রীতি ঢালিয়া দিল। তার পর জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—তোমাদের ঋণ আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না মাসী। আমাকে মনে থাক্‌বে বোলে তোমাদের কিছু শেষ চিহ্ন দিয়ে যাচ্ছি; আর তোমাদের তীর্থ কর্‌বার সামান্য কিছু খরচ......

সনৎ সেই কাগজমোড়া পুঁটুলিগুলি পুঁটির হাতে দিয়া বলিল—তোমাদের কাছে যদি কোনো দোষ ত্রুটি ঘোটে থাকে সেসব ক্ষমা কোরো......

"ওকি কথা বাবা! আমরাই আপনার কাছে......"

পুঁটির কথা শেষ হইবার আগেই সনৎ গিয়া মোটরে চড়িল ও মোটর ধূলার ঝড় উড়াইয়া সাল্‌থের পথে ছুটিয়া চলিল।

সনৎ কি দিয়াছে দেখিবার জন্য না দাঁড়াইয়া মলিনা চলিয়া যাইতেছিল। পুঁটি কাগজের মোড়ক খুলিতে খুলিতে বলিয়া উঠিল—ছাখ্ মলিনা, বাবার কাণ্ড! এমন লোককেও আমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে!

মলিনা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—দুখানা সাদা ও দুখানা পেড়ে তসর কাপড়; আটগাছা সোনার চুড়ি, তার কৌটার মধ্যে একখানা কার্ডে লেখা "মলিনার জন্যে উপহার।—সনৎ।" আর একগাছা সোনার হার, তার সঙ্গে বাঁধা কাগজে লেখা আছে—"পুঁটি-মাসীর জন্য।—সনৎ।" এবং একটা মকমলের বটুয়ার মধ্যে একশো টাকা! মলিনা সমস্ত খুঁজিয়া দেখিল তার হাতের সেই পিতলের চুড়িগাছি সনৎ ফেরত স্থায় নাই।

এই অসাধারণ বিপুল দান, এর জন্য দাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া বা কৃতজ্ঞতা জানাইবার আর অবসর নাই—তার মোটর এখন অনেক দূরে। ইহা লইতে আপত্তি করিবারও অবসর সে স্থায় নাই। এই আশ্চর্য্য দান গ্রহণ করিয়া পুঁটি ও মলিনার শোকার্ত্ত চিত্ত এমন পরিপূর্ণতায় ছাপাইয়া উঠিল যে কেউ আর কোনো কথা বলিতে পারিল না, দুজনেই উদ্‌গলিত অশ্রুধারা রোধ করিবার চেষ্টাতেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

অকস্মাৎ কার জুতার শব্দে চম্‌কিয়া তারা চাহিয়া দেখিল—পরিতোষ!

মলিনা যেন অশুচি অশুভ দৃষ্টি লাগিবার ভয়ে তাড়াতাড়ি জিনিসগুলি কাগজে জড়াইয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেল। পুঁটি গলা সাফ করিয়া বলিল—বাবু পুরী চোলে গেছে।

পরিতোষ সিঁড়িতে উঠিবে বলিয়া প্রথম পৈঁঠায় পা দিয়াছিল; পা নামাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—এঁ! এত সকালে চোলে গেল! দেখা হল না? আচ্ছা, সে ফিরে এলে বোলো আমায় যেন একটা খবর দ্যায়।

পুঁটি বলিল—আমরাও চোলে যাচ্ছি; আপনার যা বল্‌বার রাঘবকে বোলে যান।

পরিতোষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—অ্যাঁ! কোথায় যাচ্ছ তোমরা? পুরী নাকি?

পুঁটি বলিল—না, পৈরাগ।

ওঃ!—বলিয়া পরিতোষ বাহিরে চলিয়া গেল।

(১২)

পরদিন পুঁটি বাহির হইতে আসিয়া মলিনাকে বলিল—আমরা বাসা ছেড়ে দিয়েই যাব; রাণীমা এখন তীর্থে তীর্থে ঘুর্‌বেন, কবে ফির্‌বেন তার ঠিক ত নেই, কেন মিথ্যে ভাড়া গুন্‌ব?

মলিনা পুঁটির মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিল। সনতের বাসার পাশে বাসা থাকিলে কখনো না কখনো তার সঙ্গে দেখা হইলেও হইতে পারিত; এ বাসা ছাড়িয়া দেওয়া মানে সনতের সঙ্গে সকল সম্পর্কের উচ্ছেদ। মলিনা চুপ করিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে লাগিল।

মলিনাকে নীরব দেখিয়া পুঁটি বলিল—বাসারই বা আর আমাদের দরকার কি? রাণীমা বুড়ো মানুষ, বাড়ীতে তেমন পুরুষমানুষও কেউ নেই, আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁর হিল্লেতেই সুখে থাক্‌ব। পরে দর্‌কার হয় তখন কোথাও বাসা খুঁজে নেব।

মলিনা এ কথায় কি উত্তর দিবে? সে নীরব। পুঁটি আবার একটু থামিয়া বলিল—পর্‌শু সকালেই আমরা যাব; জিনিসপত্তরগুলো বেঁধে-ছেঁদে ফেলি।

পুঁটি উঠিয়া জিনিস গোছাইতে লাগিল, মলিনা সেই একই ভাবে মাথা নীচু করিয়া মাটিতে শুধুই আঙুল বুলাইতেছিল।

এমন সময় রাঘব আসিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িয়া বলিল—তোমরা চোলে গেলে ঝিমা বাবুর বড় কষ্ট হবে।

পুঁটি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া জিনিস গুছাইতে গুছাইতে কেমন একটু ধরা-গলায় বলিল—ভাত ছড়ালে কাগের অভাব কি রাঘব? কলকাতার শহরে আবার দাসী-বামনীর অভাব? তা ছাড়া তুমি পুরানো চাকর রয়েছ।

রাঘব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে শুধু বলিল—হ্যাঃ! তুমিও যেমন ঝিমা! পুছ!

রাঘবের বাক্যে কোনো অর্থ না থাকিলেও, তাতে প্রকাশ করিল অনেকখানি মানে। পুঁটি নীরবে কাজ করিতে লাগিল, মলিনা চট করিয়া একবার চোখের উপর দিয়া আঁচলের খুটটা বুলাইয়া লইল।

রাঘব একটু থামিয়া বলিয়া উঠিল—তোমরা যাচ্ছ কেন ঝিমা?

পুঁটির গলায় কথা বাধিয়া গেল, সে গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—এর চেয়ে ভালো চাকরী পাচ্ছি কিনা।

—তা বাবুকে বল্‌লে তিনি তোমাদের মাইনে বাড়িয়ে দিতেন, বাবু আমার তেমন কঞ্জুষ নয়, গরীব-দুঃখীর কদরও বোঝে, দরদও বোঝে।

—একলা মানুষের জন্যে বাবু আর কত খরচ কর্‌বেন?

—হ্যাঁ, তাও বটে।—বলিয়া রাঘব পরম বিজ্ঞ ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল। কেউই আর কোনো কথা কয় না দেখিয়া রাঘব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—যাই, আবার দুটো রেঁধে বেড়ে নিইগে। আজ থেকে ত আমার হাঁড়িঠেলা সুরু হল।

পুঁটি বলিল—আমরা যে দুদিন আছি, সে দুদিন আর তুমি রাঁধ্‌বে কেন? আমাদের এখানেই খেয়ো।

রাঘব হতাশ ভাবে হাত উল্টাইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের ভিতর দিয়া বলিল—আর মা! এক দিন মায়া বাড়িয়ে আর কি হবে?

রাঘব চলিয়া যাইতেই পুঁটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নারায়ণ মুখ তুলে চেয়েছেন, তাই বাবু এখন এখানে নেই; নইলে তাঁর সাক্ষাতে তাঁকে ছেড়ে আমরা কেমন কোরে যেতাম রে!

পুঁটির দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মলিনা এতক্ষণ পাষাণমূর্ত্তি হইয়া বসিয়া ছিল, আর সে থাকিতে পারিল না, দুই হাঁটুর ভিতর মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বিকাল বেলা পুঁটি বলিল—আমার বুঝি জ্বর এল রে মলিনা! বড় শীত কর্‌ছে, গা ভাঙ্‌ছে।

মলিনা কাছে গিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল—গা যে পুড়ে যাচ্ছে মাসী। তুমি শুয়ে পড়ো।

পুঁটিকে বিছানা পাড়িয়া শোয়াইয়া লেপ চাপা দিয়া মলিনা তাকে চাপিয়া ধরিয়া বসিল। পুঁটি বলিল—একটু জল দে মলিনা।

মলিনা একটা ঘটীতে জল আনিয়া মুখের কাছে ধরিল। পুঁটি জল

খাইয়া ঘটী রাখিতে যাইতেছিল, মলিনা তার হাত হইতে ঘটী লইল। পুঁটি বলিল—আমার এঁটো ঘটীটা ছুঁলি?

মলিনা ঘটী রাখিয়া বলিল—তা হোক।

পুঁটি কম্পবেগে কাতর স্বরে বলিল—আমার বোধ হয় বমি হবে মলিনা। আমায় একটু ধর্।

মলিনা পুঁটিকে ধরিয়া তুলিতে না তুলিতে পুঁটি ওয়াক করিয়া উঠিল। মলিনা তাড়াতাড়ি দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া পুঁটির মুখের সাম্‌নে পাতিল।

পুঁটি একটু জিরাইয়া লইয়া বলিল—তুই আমার বমি পর্য্যন্ত দুহাতে কোরে মুক্ত কর্‌লি মলিনা! এতে যে আমার পাপ হবে।

মলিনা ঘর পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—তোমার পাপ হবে কি না জানি না মাসী; কিন্তু আমি যদি না করি তা হলে আমার পাপ হবে এ আমি জানি।

পুঁটি খানিকক্ষণ নীরবে পড়িয়া থাকিয়া বলিল—আজ আর তা হলে কেমন কোরে যাওয়া হয় রে?

মলিনার মন কেন অকস্মাৎ খুসীতে ভরিয়া উঠিল; পুঁটির অসুখ যেন দেবতার দয়া বলিয়া মনে হইল; কিন্তু তখনি সে সেই আনন্দ দমন করিয়া বলিল—তা এমন অসুখ নিয়ে নতুন জায়গায় কেমন কোরে যাওয়া যাবে। একটু ভালো হও, তারপর গেলেই হবে।

পুঁটি কাতর স্বরে বলিল—কিন্তু রাণীমা যে কালই তীর্থে রওনা হবে।

মলিনা সান্ত্বনা দিয়া বলিল—তা যদি যান ত কি করা যাবে—দৈবের ওপর ত হাত নেই।

পুঁটি নিরুপায় হইয়াও বটে এবং রোগের প্রকোপে আচ্ছন্ন হইয়াও বটে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মলিনা দেখিল পুঁটির গলা অত্যন্ত ঘড়ঘড় করিতেছ, শ্বাসকষ্ট হইতেছে, বুকে-পিঠে বেদনা, জ্বর সমভাবে প্রবল।

মলিনা রাঘবকে দিয়া এক জন ডাক্তার ডাকাইয়া আনাইল - ডাক্তার দেখিয়া শুনিয়া বলিল—ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া হইয়াছে।

মলিনার আহার নিদ্রা বিশ্রাম সব গেল; সে এক ডাক্তারের বিবিধ আদেশ পালন করিয়া রোগীর সেবায় নিযুক্ত হইল।

বিকালে পরিতোষ মলিনার সন্ধানে আসিয়া রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে রাঘব, তোদের ঝি-মা আর বামুন-দিদি চোলে গেছে?

রাঘব মুখ বিষণ্ণ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাবু, ঝি-মার বড় ব্যামো, দিদিমণি কাঁদ্‌তে লেগেছে।

পরিতোষ খুসী হইয়া উৎসাহে সোজা হইয়া বসিয়া ব্যগ্র স্বরে বলিল—কি অসুখ রে?

রাঘব অসুখের নামটা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে করিতে হতাশ হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল—ঐ যে ডাক্তার-বাবু কি বোলে গেল—নেবুমিঞা আর হিংফুলুরী না কি—অতশত মনেও থাকে না।

—ও! সে ত বড় শক্ত ব্যারাম! যাই একবার দেখে আসি।—বলিয়া পরিতোষ মলিনাদের ঘরের দিকে গেল।

পরিতোষকে দেখিয়া আজ মলিনা সঙ্কুচিত হইল না; যে বিপদে পড়িয়া সে একলা যুঝিতেছে তার মধ্যে একজন পরিচিত লোকের মুখ দেখিলেও সাহস বাড়ে।

মলিনাকে সহজ ভাবে কাজ করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া খুসী হইয়া ও সাহস পাইয়া পরিতোষ বলিল—তাই ত! অসুখ কবে হল?

মলিনা পুল্‌টিশ গরম করিতে করিতে বলিল—কাল বিকেল থেকে।

পরিতোষ পুঁটির দিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে নীচু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—মাসী কি ঘুমুচ্ছে?

মলিনা বলিল—না, কাল থেকেই অমনি বেঘোরে পোড়ে আছে।

পরিতোষ ডালকুত্তা-মাগীকে কাবু দেখিয়া মনে মনে খুশী হইয়া অত্যন্ত কাতর হতাশ স্বরে বলিল—তাই ত!

মলিনা পরিতোষের কথা বলার ভঙ্গীতে চমকিত হইয়া ফিরিয়া পরিতোষের মুখের দিকে চাহিয়াই ভয় পাইয়া গেল; তার দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

পরিতোষ জোরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। চিকিৎসার সেবার ত্রুটি ত হতে দেবো না।

এই বলিয়াই পরিতোষ দিব্য সপ্রতিভ ভাবে মলিনার কাছে গিয়া বসিয়া পুলটিশ প্রস্তুত করিতে লাগিল। সে গরম পুলটিশ সহাইয়া সহাইয়া পুঁটির বুকে বসাইয়া বাঁধিয়া দিল। ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইয়াছে জানিয়া পুঁটিকে ঔষধ খাওয়াইয়া মুখ মুছাইয়া দিল।

কিন্তু পুঁটি একটা কি অব্যক্ত যন্ত্রণায় লাল চোখ বিস্ফারিত করিয়া বড় জোরে নিশ্বাস লইতে লইতে গোঙাইতে লাগিল। চোখ-জ্বালানে বাবুটা যে তার সেবা করিতেছে, তাহা সে টেরও পাইল না।

পরিতোষ মলিনাকে বলিল—একজন ডাক্তার ডেকে আনি। ভালো বোধ হচ্ছে না!

পরিতোষ বাহির হইয়া চলিয়া গেল। যে-পরিতোষকে দূরে দেখিলে মলিনা ভয় পাইত এখন তারই সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় সে বসিয়া বসিয়া নিমেষ গণিতে লাগিল।

পরিতোষ তাড়াতাড়ি মেডিকাল কলেজে গিয়া এক সাহেব-ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া তাকে বলিল—সনৎ-ডাক্তারের এক আত্মীয়ার খুব

অসুখ, সনৎ-ডাক্তার এখানে নেই, ডাক্তার-সাহেব গিয়ে যদি তাঁকে দেখেন।

সনতের নামে আহ্বান করিতে ডাক্তার তখনি মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পুঁটি যে সনতের আত্মীয়া এ সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস তার বাসগৃহ দেখিয়া হইয়াছিল, তাহা সুন্দরী মলিনার কাতরতা ও শুশ্রূষা দেখিয়া সাহেবের দূর হইয়া গেল; সাহেব মনে করিল নেটিভগুলা ডাক্তার হইলেও মেয়েদের স্বাস্থ্যতত্ত্বের দিকে তাদের লক্ষ্য এমনই।

সাহেব-ডাক্তার পুঁটিকে দেখিয়া ব্যবস্থা করিয়া বলিল—এই ঘরটা বড় অস্বাস্থ্যকর। সম্ভব হলে একটা ভালো ঘরে রোগীকে নিয়ে রাখুন; আর সনৎ-বাবুকে আস্‌তে টেলিগ্রাম কোরে দিন, রোগ অত্যন্ত কঠিন, রক্ষা পাওয়া শক্ত।

মলিনা পরিতোষকে একধারে ডাকিয়া তার হাতে ষোলটি টাকা দিতে গেল। পরিতোষ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল—ওর জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ওসব আমি ঠিক কোরে দেবো এখন।

ডাক্তারের সাম্‌নে মলিনা বেশী পীড়াপীড়ি করিতে পারিল না, ভাবিল পরে সে টাকাটা দিয়া দিবে; কিন্তু পরিতোষের এই ব্যবহারে মলিনার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

ডাক্তার-সাহেব চলিয়া গেলে মলিনা উৎসুক হইয়া পরিতোষকে জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার-সাহেব কি বল্‌লেন।

পরিতোষ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—বড় শক্ত ব্যামো।

মলিনা সজল চোখে কাতর দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে?

পরিতোষ সাহস দিয়া বলিল—ভয় কি? আমি রয়েছি! আমি

থাক্‌তে তোমার কোনো ভয় নেই, মলিন।

মলিনা চোখ মুছিতে মুছিতে ষোলোটি টাকা পরিতোষের সাম্‌নে রাখিয়া দিয়া পুঁটির কাছে যাইতেছিল, পরিতোষ খপ করিয়া মলিনার হাত ধরিয়া টাকাগুলা তুলিয়া তার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল—ও তোমার দিতে হবে না; অন্য খরচ ত ঢের আছে। পুঁটি-মাসী বেঁচে উঠ্‌লেই আমার সব পাওয়া হবে।

মলিনা কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে পরিতোষের দিকে একবার চাহিয়া পুঁটির কাছে গিয়া বসিল।

পরিতোষ কিন্তু মলিনাকে বলিল না যে ডাক্তার-সাহেব অম্‌নি দেখিয়া গেছে, তাকে কিছুই দিতে হয় নাই। পরিতোষ প্রেস্‌ক্রিপ্‌শানখানা লইয়া বলিল—আমি সায়েব-বাড়ী থেকে ওষুধটা চট কোরে নিয়ে আসি। তুমি একলা থাক্‌তে পার্‌বে ততক্ষণ?

মলিনা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া একলা থাকতে পারিবে জানাইল এবং উঠিয়া আবার দুটি টাকা আনিয়া পরিতোষের সাম্‌নে রাখিল। দেখিয়া পরিতোষ বলিল—ও আবার কি? তুমি টাকার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক ত। আমার নিজের ত একটা কর্ত্তব্য আছে......তোমার এতটুকু দুঃখ দুর করতে আমি প্রাণ দিতে পারি।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস জোরে ফেলিয়া আড় চোখে একবার পুঁটির দিকে তাকাইয়া লইল, তারপর গলার স্বর খুব নামাইয়া হুতাশের সঙ্গে বলিল—যাকে মানুষ ভালোবাসে তার জন্যে সর্ব্বস্ব খুইয়েও সুখ!

মলিনা মুখ লাল করিয়া সরিয়া গেল। পরিতোষ বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় যাইতে যাইতে সে বলিতে লাগিল—হে কালী, পুঁটির টুঁটিটা সনৎ ফিরে আস্‌বার আগেই টিপে নিকেশ কোরে

দাও, হেই মা! তোমায় আমি খুসী কোরে ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি আর জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজো দেবো। হেই মা, মুখ তুলে চাও, হেই মা!

পরিতোষ ঔষধের দোকানে সনৎ-ডাক্তারের নামে ধার লিখাইয়া অমনি ঔষধ সংগ্রহ করিল; তার পর কিছু বেদানা আঙুর গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কিনিয়া মলিনার কাছে ফিরিল। পরিতোষ বলিল—ডাক্তার-সায়েব বলেছেন, রোগীকে এ ঘর থেকে সরিয়ে ভালো ঘরে রাখ্‌তে। তা আমার বাড়ীতে চলো না তোমরা। দিব্যি হাওয়াদার আলো-ভরা ফর্দ্দা ঘর!

মলিনা পুঁটির মুখের দিকে চাহিল। পুঁটির এখন একটু জ্ঞান হইয়াছে; পুঁটি কষ্টে গোঙাইয়া বলিল আর কেন টানা-হেঁচ্‌ড়া বাবা। আমি মরি, তার পর একেবারে নিমতলায় ঘুরে এস। এ ঘর থেকে আর কোথাও নিয়ে যেয়ো না।

পরিতোষ বলিল—তবে আমি সনতের ঘরে রাত্রে থাক্‌ব'খন। যখন যা দর্‌কার আমি এসে কর্‌ব; তুমি কিছু ভেবো না মলিনা।

মলিনার মনে পরিতোষের প্রতি যে বিরাগ সঞ্চিত হইয়া ছিল, তাহা অনেকখানি দূর হইয়া গিয়াছিল। সে মুগ্ধ স্বরে বলিল—না, আপনাকে কষ্ট কোরে রাত্রে থাক্‌তে হবে না, রাঘব আছে .....

পরিতোষ গম্ভীর হইয়া বলিল—আমার কর্ত্তব্য আমার কাছে; আমি কেন কর্‌ছি তুমি যদি বুঝ্‌তে?

মলিনার মুখে আবার গোলাপ ফুটিয়া উঠিল; সে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল।

পরিতোষ সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পুঁটির সেবা করিল—পুঁটির প্রতি মমতার জন্য নয়; অমুক্ষণ মলিনার কাছে কাছে থাকিবার সুযোগ বলিয়া

এবং ইহারই দ্বারা সে মলিনার অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারিবে এই আশায়।

পরদিন প্রাতে আবার সে সাহেব-ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল এবং মলিনার নিকট হইতে ডাক্তারের দক্ষিণার টাকা সে কিছুতেই গ্রহণ করিল না।

এত চিকিৎসা ও সেবা সত্ত্বেও পুঁটির অবস্থা দিন দিন খারাপই হইয়া পড়িতেছিল এবং পরিতোষ তাতে পরিতুষ্ট ছাড়া অসন্তুষ্ট হইতেছিল না—তার বড় ভয় হইতেছিল সনৎকে, সে এখন আসিয়া পড়িলেই এত আয়োজন সব পণ্ড হইয়া যাইবে। পুঁটির মৃত্যু হইলে সনতের অবর্ত্তমানে মলিনা তারই আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে এই তার দুরাশা তাকে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

(১৩)

সনৎ স্ত্রীকে লইয়া পুরীতে গিয়াও শান্তি পাইতেছিল না। সে সমস্ত দিন চুপ করিয়া বিষণ্ণ মুখে বসিয়া শুধু ভাবে মলিনারই কথা। সুবাসিনী বুঝিতে পারে স্বামীর মনের মধ্যে একটা কিছু দারুণ চিন্তা বাসা বাঁধিয়াছে; কিন্তু সে তাহা জানিবার জন্য একটুও ঔৎসুক্য দেখায় না। যদি তাহা বলিবার হইত তবে ত স্বামী আপনিই বলিত; তাহা যখন বলে নাই তখন তার মনের মধ্যে উঁকি মারিবার কৌতূহল প্রকাশ করা ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু সুবাসিনী প্রাণপণ যত্ন করিয়া সেবা করিয়া স্বামীর মন সুস্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। সনৎ সমস্তক্ষণ ঘরের মধ্যেই বসিয়া চিন্তায় ডুবিয়া থাকে, বাহির হইতে চায় না; ইহা দেখিয়া সুবাসিনী একদিন বলিল—তুমি কি ঘরের মধ্যে চুপ কোরে বোসে থাক্‌বার জন্যে এত খরচ কোরে কল্‌কাতা থেকে এখানে এলে!

সনৎ বিষণ্ণ দৃষ্টি তুলিয়া উদাস স্বরে বলিল—কোথায় বা যাই?

—কেন সমুদ্রের ধারে চলো না।

—চলো।

সনৎকে লইয়া সুবাসিনী সমুদ্রের ধারে গিয়াই সেই বিরাট সৌন্দর্য্য দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল; কিন্তু সনতের মুখের ম্লানিমা একটুও দূর হইল না।

সুবাসিনী সীগাল পাখী, জেলি মাছ, বিবিধ বর্ণের ঝিনুক, নুলিয়াদের মাছ ধরা, নির্ভয়ে নৌকায় যাওয়া, দেখিয়া কত আনন্দ কত বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু সনৎ তার সঙ্গে শুধু এক-আধটু হাঁ হুঁ ছাড়া আর কোনো-রকম সাড়া দিল না।

সুবাসিনীর মনে হইতে লাগিল যেন তার স্বামী তাকে ছাড়িয়া অনেক দূরে অন্য কোনো গ্রহলোকে শূন্যপথে প্রস্থান করিয়াছে, সেখানে তাকে দেখিতে হয় দূরবীন কসিয়া এবং তার সাড়া কান পাতিয়াও পাওয়া যায় না। সুবাসিনী এই সুদূরের লোকটির সঙ্গে একলা থাকিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন সুবাসিনী সনৎকে বলিল—চলো কল্‌কাতা ফিরে যাই।

সনৎ উদাস ভাবে বলিল—কেন? এখানে দুজনে নিরিবিলি ত বেশ আছি। কল্‌কাতায় গেলেই ত আবার দুজনের ছাড়াছাড়ি।

সুবাসিনী আর কিছু বলিল না; কিন্তু মনে মনে ভাবিল কাছাকাছি ও ছাড়াছাড়ির মধ্যে এখন প্রভেদ ও পার্থক্য কতটুকু আছে।

সনতের সাত দিনের ছুটি ফুরাইতে আর এক দিন মাত্র বাকী আছে। সুবাসিনী সনৎকে বলিল—তোমার ছুটি ত ফুরিয়ে গেল; কল্‌কাতায় যাবে না?

সনৎ স্ত্রীর দিকে না চাহিয়া উত্তর করিল—আরো ছুটির জন্যে টেলি-গ্রাম করেছি।

যে কলিকাতায় মলিনা নাই সেখানে যাইতে সনতের মন সরিতেছিল না। কিন্তু সুবাসিনী স্বামীর মনের রহস্যের কিছুমাত্র সন্ধান না পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিকাল বেলা সনতের টেলিগ্রামের জবাব আসিল, আরো একমাস ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে।

সুবাসিনী তাহা দেখিয়া খুসী হইল, এই দীর্ঘ এক মাস সমুদ্রের প্রমুক্ত সৌন্দর্যে অবগাহন করিয়া তার স্বামীর মনের সব ম্লানতা, সব বিষণ্ণতা ধৌত নির্ম্মুক্ত হইয়া যাইতে পারিবে।

হঠাৎ সনৎ বলিয়া উঠিল—একমাস ত ছুটি পেলাম সুবাস, চলো তীর্থে তীর্থে বেড়িয়ে আসি।

স্বামীর হঠাৎ তীর্থে ভক্তি হওয়ার মতন কোনো লক্ষণ সুবাসিনী ত এতদিন তার স্বামীর মধ্যে দেখে নাই। সে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই বলিল—পথে পথে ঘোর্‌বার মতন কাপড়-চোপড় ত সঙ্গে আনিনি।

সনৎ বলিল—তবে চলো কল্‌কাতায় গিয়ে কাপড়চোপড় নিয়ে তীর্থ-যাত্রা করা যাবে—এক জায়গায় বোসে ভালো লাগ্‌ছে না।

সুবাসিনী বুঝিল যে তীর্থে মতি হওয়ার মতন বয়স ও প্রবৃত্তি না হইলেও অশান্ত মনকে বিশ্রাম না দিবার ইচ্ছাতেই তার স্বামীর এই তীর্থ-পর্য্যটনের আকিঞ্চন। কিন্তু সনতের মনের সবখানি জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল মলিনা, কোনো তীর্থের পাষাণ-দেবতা নয়; মলিনা তার নূতন মুনিবের সঙ্গে তীর্থে তীর্থে ফিরিতেছে, যদি কোথাও হঠাৎ তাকে একটিবার দেখিতে পাওয়া যায় এই দুরাশাই সনতের মনকে তীর্থের পানে টানিতেছিল।

(১৪)

পুঁটির প্রাণটা ইহলোক ও পরলোকের সন্ধিস্থলে সাত দিন ধরিয়া

ক্রমাগত দোল খাইতে খাইতে এখন অবসন্ন হইয়া ক্রমশ পরলোকের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। এখন আর মৃত্যুর কোনো সংশয় নাই, এখন জীবনের মেয়াদ আর দিনের গণনায় নয়, ঘণ্টায়; ঘণ্টায় ঘণ্টায় যমের বাহন মহিষের গলার ঘণ্টারব স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

মলিনা ক্রমাগত চোখের জলে তেত্রিশ কোটি দেবতার পা ধোয়াইয়া এই কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিল যে "হে ঠাকুর, ডাক্তার-বাবু আসা পর্যান্ত মাসীকে বাঁচিয়ে রাখো।" মলিনার আশা হইতেছিল সনৎ আনিয়া চিকিৎসা করিলেই তার আশ্রয় ও অবলম্বন মাসী বাঁচিয়া যাইবে।

সনতের ছুটির দিন একটি একটি করিয়া গণিয়া ত মলিনা শেষ করিয়া আনিল, তবু ত সনৎ ফিরিল না। মলিনা ঘন ঘন ছুটিয়া ছুটিয়া সনতের ঘরে গিয়া দেখিয়া আসিতেছিল সনৎ আসিল কি না। হয় ত সনৎ আসিয়া নিজের ঘরে বসিয়া থাকিবে, তারা কেউ টের পাইবে না, আর সেই অবকাশে যম তার মাসীর ক্লান্ত প্রাণটুকু কাড়িয়া লইবে, এই আশঙ্কায় মলিনা সুস্থির হইয়া পুঁটির কাছেও বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না।

শীতের রাত্রে কোয়াসা ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়া কলিকাতার পথের গ্যাসের আলোগুলো যেমন দেখায় তেমনি মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন ঘোলাটে চোখ বড় বড় করিয়া পুঁটি অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল - বাবা এল?

মলিনা কান্নাধরা কণ্ঠে বলিল—না।

পরিতোষ পুঁটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—সনৎ নাই বা আসুক মাসী, তোমার ভয় কি, আমি রয়েছি।

পুঁটি হতাশার হাসি দিয়া শিয়রের যমরাজকে উপহাস করিয়া বলিল—আমার আবার ভয়! আমার ত সব ভয় ফুরিয়ে এল বোলে, ভয় ঐ হতভাগীর জন্মে।

পরিতোষ আগ্রহের আতিশয্যে তাড়াতাড়ি বলিল—তার জন্মেই বা ভয় কি মাসী, আমি মলিনার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগ্‌তে দেবো না।...... তোমাদের ত সনৎ আর সনৎ। কিন্তু সনৎ তোমাদের দাসী বামনী ছাড়া আর-কিছু কি ভাবে? তাকে চিঠি দিলাম, টেলিগ্রাম কর্‌লাম— একটা জবাব পর্য্যন্ত নেই। আসা ত দূরে থাক্, ডাক্তার-সাহেব বল্‌ছিল সে আরো এক মাসের ছুটি নিয়েছে। সে বৌ নিয়ে দিব্যি সুখে আছে, তোমাদের কথা ভাব্‌তে তার দায় পোড়ে গেছে—তোমরাও যেমন! আর এদিকে আমি যে এত কর্‌ছি, তবু তোমাদের......

পরিতোষ মলিনার দিকে চাহিয়া যেন অকৃতজ্ঞতায় পরম আহত হইয়া কথার মাঝখানেই হঠাৎ থামিয়া গেল।

পুঁটি বলিল—না বাবা, তোমার ঋণ আমরা সাত জন্মেও শোধ কর্‌তে পার্‌ব না।

মলিনা আস্তে আস্তে উঠিয়া সনতের ঘরে দেখিতে চলিল সে আসিয়াছে কি না। পরিতোষ বলিতেছে সনৎকে চিঠি লিখিয়াছে, জরুরী তার করিয়াছে। তবু সনৎ আসিবে না—এমন নির্ম্মম বলিয়া তাকে কল্পনা করিতে যে মলিনার বুক ভাঙিয়া পড়িতেছিল! তার মাসীর মৃত্যু, তার অসহায় অবস্থা. পরিতোষের লোলুপ কবলে পড়িবার সম্ভাবনা —এ ত্রিবিধ দুঃখের চেয়েও সনতের এই নিষ্ঠুর কঠোর উদাসীনতা মলিনাকে অধিক কাতর করিতেছিল।

সনৎ পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তার সাল্‌কের বাড়ীতেই আছে; যে বাসার প্রত্যেক পদার্থ মলিনার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে সে বাসায় ফিরিতে তার ভয় করিতেছিল। আজ তারা স্বামীস্ত্রীতে তীর্থযাত্রা করিবে। যে দেবতার সন্ধানে সনতের এই তীর্থযাত্রা, তার আদিতীর্থ একবার দেখিয়া লইবার বাসনা সনতের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সে

সুবাসিনীকে বলিল—তুমি ঠিক হয়ে থেকো, আমি ঝাঁ কোরে একবার কল্‌কাতা থেকে ঘুরে আসি।

সনৎ বাসায় আসিয়া বাহিরের ঘরে রাঘবকে দেখিতে পাইল না। সে উপরের ঘরে উঠিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সে মনে করিয়া আসিয়াছিল এই ঘরে আসিয়া সে দেখিবে সমস্ত জিনিস ওলটাল হইয়া মলিনার অভাবে হাহাকার করিতেছে। কিন্তু এ ঘরে ত কোথাও এতটুকু বেদনার চিহ্ন নাই, এ যে মলিনার যত্নের স্মৃতিটুকু বুকে পুষিয়া দিব্য প্রফুল্ল হইয়াই রহিয়াছে। সনৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া একখানা গদি-মোড়া তিনপাশ উঁচু গভীর চেয়ারের মধ্যে বসিয়া পড়িল। সে সেই চেয়ারের গভীর জঠরের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া চোখ বুজিয়া মলিনারই ধ্যানে ডুব দিল।

অকস্মাৎ ঘরে কার পায়ের শব্দে চোখ মেলিয়াই সনৎ দেখিল মলিনা; হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত লাভে উৎফুল্ল হইয়া সনৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল—মলিনা, তুমি আছ!

মলিনা ঘরে আসিয়া গভীর চেয়ারের দেয়ালের আড়ালে লুক্কায়িত সনৎকে দেখিতে পায় নাই; হঠাৎ সেখান হইতে সনৎকে লাফ দিয়া উঠিতে দেখিয়া সে প্রথমটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিয়াছিল; পরক্ষণেই সনৎকে দেখিয়া ও তার কথায় যে আনন্দের আগ্রহ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা শুনিয়া মলিনার মুখ প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সনৎ ইতিমধ্যে আগাইয়া গিয়া দুই হাতে মলিনার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তুমি আমায় ছেড়ে যাওনি? ভাগ্যিস আমি এলাম, নইলে ত আজই তোমায় খুঁজ্‌তে তীর্থে তীর্থে ঘুর্‌তে বেরুব ঠিক করেছিলাম। এই কদিনে তোমার চেহারা এমন কেন হয়ে গেছে মলিনা?

মলিনা অতিসুখের নিবিড় বেদনায় ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া বলিল—মাসীর বড় অসুখ, এখন-তখন অবস্থা।

সনৎ বলিল—পুঁটি-মাসীর অসুখ! আমায় কেন খবর দাওনি?

মলিনা সনতের হাত হইতে অতি অনিচ্ছাতেই হাত দুখানি ছাড়াইয়া লইয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া বলিল—পরিতোষ-বাবু ত আপনাকে চিঠি দিয়েছিলেন, তার করেছিলেন।

সনৎ উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল—মিথ্যেবাদী, স্কাউণ্ড্রেল! ...... যাক, এখন চলো, পুঁটি-মাসীকে দেখিগে।

মলিনার পিছনে পিছনে সনৎকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই পরিতোষের মুখ একেবারে চুন হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভয়-ও-হতাশা-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিল—তুমি কখন এলে?

সনৎ সে কথার উত্তর না দিয়া এবং তাকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে পুঁটির কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া ডাকিল—মাসী!

পুঁটি চট করিয়া চোখ খুলিয়া বলিল—অঁ্যা! কে? বাবা? এসেছ? তোমার জন্যে আমার যে মরা হচ্ছে না। বাবা, তুমি একলা একটু আমার কাছে এস।

মলিনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষও চলিল। বাহিরে আসিয়া পরিতোষ হতাশা-ব্যথিত স্বরে বলিল—মলিনা, আমার এত পরিশ্রম সব কি বৃথা হবে? তোমার কাছ থেকে আমি কিছুই প্রতিদান পাব না?

মলিনা মাথা নত করিয়া মৃদু ভাবে বলিল—আপনার ঋণ শোধ করতে পার্‌ব না; জন্ম জন্ম কৃতজ্ঞ হয়ে থাক্‌ব।

পরিতোষ চোখ মুখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল—ড্যাম্ কৃতজ্ঞতা! মাসীর মৃত্যু হলে তুমি আমার বাড়ীতে যাবে কি না বলো। মাইরি বল্‌ছি, আমি তোমায় প্রাণের অধিক ভালোবাসি। তোমায় নইলে আমি বাঁচ্‌ব না।

পরিতোষ ব্যগ্র বাহু মেলিয়া মলিনাকে ধরিতে যাইতেছিল ; মলিনা সরিয়া গিয়া সহজ-ভাবেই পাশের ঘরে গিয়া বলিল—রাঘব, বাবু এসেছেন। ষ্টোভটা ধরিয়ে দাও, খাবার তৈরি কোরে দি।

রাঘব লাফাইয়া উঠিল—বাবু এসেছেন ? আঃ! বাঁচা গেল। যাই বামুন-দিদি, আগে বাবুকে পেন্নামটা কোরে আসি।

রাঘব ছুটিয়া যায় আর কি। মলিনা বলিল—পেন্নাম পরে কোরো, এখন আগে ষ্টোভটা ধরাও।

রাঘবের সঙ্গে মিলিয়া মলিনাকে সনতের জন্য রন্ধনের উদ্‌যোগে ব্যাপৃত হইতে দেখিয়া পরিতোষ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। তার কেবলি মনে হইতেছিল—সব ভেস্তে গেল, সব পণ্ড হল। বৃথাই বুড়ী-মাগীর করণা কোরে খেটে মরলাম!

পুঁটি সনৎকে ঘরে একলা দেখিয়া বলিল—আর আমার বেশী দেরি নেই বাবা, তোমার জন্যেই আমার প্রাণটা এখনো বেরোয়নি। মলিনা রইল ; তার মান ইজ্জত ধর্ম্ম সব তোমার হাতে সঁপে যাচ্ছি, তুমি তাকে রক্ষা কোরো।

পুঁটি কষ্টে থরথর-কম্পিত দুই হাত দিয়া সনতের একখানি হাত চাপিয়া ধরিল ; তার দুই চোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সনৎ স্তব্ধ।

একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পুঁটি বলিল—আমার বালিসের তলে চাবি আছে ; ঐ টিনের প্যাঁট্‌রাটা খোলো ত বাবা। ওর তলায় একখানা চিঠি আছে ; ওখানি মলিনার মা আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন এই বোলে যে,যদি কখনো মলিনার মন চঞ্চল হয়, সে যদি অধর্ম্মের দিকে টলে, তবে তাকে এই চিঠি দিয়ো, এর মধ্যে তার রক্ষা-কবচ আছে। ঐ

চিঠিখানা তোমার কাছে রেখে দিয়ো, দরকার হলে মলিনাকে দিয়ো, ঐ তার মার মরণ-কালের আশীর্ব্বাদ।

এতগুলা কথা বলিয়া পুঁটি অবসন্ন হইয়া পড়িল। সনৎ তাড়াতাড়ি তার নাড়ী দেখিয়া তাকে কিছু ঔষধ দিবার জন্য উঠিল এবং দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল—মলিনা।

মলিনা আসিলে সনৎ ঔষধ পথ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া পুঁটিকে ঔষধ পথ্য খাওয়াইল। সনৎ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—সমস্ত ঔষধ আসিয়াছে সাহেবের ডাক্তারখানা হইতে এবং ব্যবস্থাও সব বড় সাহেব-ডাক্তারের। সনৎ খুসী হইয়া বলিল—যাক, মাসীর তা হলে চিকিৎসার কিছু ত্রুটি হয়নি।

পুঁটি বলিল—না বাবা, পরিতোষ সব করেছে, পেটের বেটাতেও এত করতে পারত না। ভগবান তার সুমতি দিন।

পরিতোষের মিথ্যা ছলনার পরিচয় পাইয়া সনৎ যে তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তার এই পরোপকারের পরিচয়ের আনন্দে চাপা পড়িয়া গেল।

মলিনা আবার সনতের আহারের উদ্‌যোগ করিতে চলিয়া গেল। সনৎ পুঁটির বাক্স খুলিয়া কাঁচা মেয়েলি হাতে মলিনার নাম লেখা একখানা চিঠি বাহির করিয়া নিজের পকেটে রাখিল।

পুঁটির জীবনীশক্তি দেখিতে দেখিতে অতি দ্রুত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। সনৎ মলিনাকে ডাকিয়া বলিল—রান্না পোড়ে থাক, তুমি কাছে থাকো, আর বেশী দেরি নেই।

মলিনা এই সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তবু তাহা উপস্থিত দেখিয়া সে ব্যাকুল হইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আস্তে আস্তে ঘুম আসার মতন মৃত্যু আসিয়া পুঁটির জীবনের শেষ

স্পন্দনটুকু থামাইয়া দিল। মলিনা তার বিছানার উপর মুখ গুঁজিয়া উচ্ছ্বসিত কান্নাকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সনৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আবার এই বাড়ী হইতে আর-একটি মড়া বাহির হইল—সনতেরই দেওয়া তসরের কাপড় পরিয়া তসরের কাপড় ঢাকা দিয়া। সনৎ স্বয়ং শব সৎকার করিতে চলিল। সনৎ বাড়ীতে সুবাসিনীকে একটা চিঠি লিখিয়া পাঠাইল –

সুবাস, বিশেষ প্রতিবন্ধকে তীর্থে যাওয়া বন্ধ রাখ্‌তে হল। আমি কবে যে তোমার কাছে যেতে পার্‌ব তার ঠিক নেই।—সনৎ।

সুবাসিনী সন্ধ্যার সময় স্বামীর প্রতীক্ষায় বাক্‌স বিছানা বাঁধিয়া, খাবার গুছাইয়া, নিজে সজ্জিত হইয়া বসিয়া ছিল। সে চিঠি পড়িয়া শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সমস্ত সজ্জা খুলিয়া ফেলিতে বসিল।

(১৪)

পুঁটির অবর্ত্তমানে মলিনাকে এখানে একলা রাখা সঙ্গত কি না, সনতের মনে এই প্রশ্ন উঠিল। এখানে যদি নাই রাখে তবে কোথায় তাকে রাখা যাইতে পারে? সনতের বাড়ীতে সুবাসিনীর কাছে? এই কথা মনে হইতেই সনতের মনে কেমন একটা লজ্জা ও ভয় বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতন হঠাৎ চমক দিয়া গেল; সে যে এতকাল মলিনার সঙ্গে এমন ভাবে পরিচিত হইয়াছে, তার রাধুনীটি যে এমন রূপবতী ও যৌবনসম্পন্না, এ কথা সে কখনো তার স্ত্রীর কাছে বলে নাই। তখন সনতের মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে—সে কি ইচ্ছা করিয়া ঐ কথা গোপন রাখিয়াছে কোনো মন্দ অভিসন্ধিতে? তার মন নৈতিক গর্ব্বে আঘাত

পাইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—তা তো কখনো নয়। তবে সে তার স্ত্রীর কাছে মলিনার কথা বলে নাই কেন? বলার কোনো আবশ্যক বা উপলক্ষ্য হয় নাই বলিয়াই। এতদিন যখন বলা হয় নাই, তখন এখন বলিতে গেলে সুবাসিনীর মনে অকারণ সন্দেহই জাগাইয়া তোলা হইবে; এবং সন্দিগ্ধ স্ত্রীর কাছে সুন্দরী যুবতীকে আশ্রয় দিয়া রাখিলে তাকে অনাবশ্যক ও অকারণ হিংসায় জ্বালাইয়া পীড়া দেওয়া হইবে। তার চেয়ে মলিনা যেমন আছে তেমনি থাকুক; মলিনার বাসায় খুদির মা আছে, রাঘব আছে, আর একজন ঝি রাখিতে ত হইবেই, আর সনৎ নিজে আছে, অতএব মলিনাকে দেখিবার শুনিবার লোকের অভাব কি। অধিকন্তু সনতের বাসার জন্য একজন রাঁধুনি ত চাইই—অন্য নূতন লোককে আবার মাইনে দিয়া না রাখিয়া মলিনাকে রাখিলেই কম খরচে বাড়ীর যত্ন পাওয়া যাইবে।

মলিনাকে এইখানে রাখাই ঠিক, স্থির করিয়াই সনতের মন যেন একটা বোঝা নামাইয়া হাল্কা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মলিনাকে যে দূরে সরাইতে হইবে না, সনৎ যেখানে অধিক সময় থাকে সেইখানেই যে মলিনা থাকিবে, এরই একটা আনন্দে সনতের মন স্বচ্ছন্দ অনুভব করিতে লাগিল। পুঁটির মৃত্যুর পর সনৎই যে মলিনার আশ্রয় অবলম্বন অভিভাবক এবং একমাত্র আপনার জন, মলিনা যে তারই, এই অধিকারের আনন্দ তার মনকে রসসিক্ত করিয়া তুলিল; মলিনাকে যে সুবাসিনীর অজ্ঞাতে গোপনে সনৎ আপনার কাছে রাখিয়াছে এরই একটা অস্পষ্ট লজ্জা ও ভয় মলিনার প্রতি তার আকর্ষণকে আরো মোহময় মদির করিতে লাগিল। যে গোপনতার অন্তরালে মলিনা ও সনতের মিলন ঘটিয়াছিল তার অল্প দৃশ্য ও অল্প অদৃশ্য অস্পষ্টতাই সেই মিলনে মাদকতা ও সৌন্দর্য্য সঞ্চার করিয়া দিতেছিল।

একমাস পরে পুঁটির শ্রাদ্ধ মলিনাই করিয়াছে। সেই মরণপারের হিতৈষিণীকে মলিনা এইরূপে শ্রদ্ধা দেখাইয়া কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেও তাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই—তার কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ কি করিলে কতটুকু শোধ করিতে পারা যাইবে তারই সন্ধানে মলিনার মন সতত ব্যস্ত।

একদিন সকাল বেলা সনৎ হাসপাতালে যাইবার উদ্‌যোগ করিতেছে, মলিনা আসিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইল। সনৎ তাকে দেখিয়াই আনন্দোজ্জ্বল মুখে জিজ্ঞাসা করিল—কি মলিনা?

মলিনা লজ্জায় স্মিত মুখ নত করিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিল—মাসীর অসুখের সময় বাবা তারকনাথের পূজো মানত করেছিলাম। খুদির মা আজ তারকেশ্বর যাচ্ছে। আমি যাব?

মলিনার এই অনুমতি লইতে আসায় সনতের মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল এই ভাবিয়া যে মলিনা এখন একান্ত তারই। সে হাসিমুখে বলিল—বাবা তারকনাথ ত তোমার মানতের মান রাখেন নি, তবে তুমি কেন তাঁর পূজো দিতে যাবে?

মলিনার মুখ মলিন হইয়া গেল, সে জলভরা সুন্দর চোখ দুটি তুলিয়া একবার সনতের দিকে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নত করিয়া বলিল—দেবতার ঋণ শোধ না কোরে রাখ্‌তে নেই, তাতে মাসীর সদ্‌গতি হবে না।

এই কথার মধ্যে শোকের যে সুর বাজিয়া গেল তাতে সনতের মুখও গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সনৎ বলিল—কিন্তু আজ চড়ক, আজকে যে বড় ভিড় হবে। তুমি না গিয়ে খুদির মার হাতে পূজো পাঠালে হত না?

মলিনা আবার তার বড় বড় চোখ দুটি সনতের দিকে ঈষৎ তুলিয়া বলিল—খুদীর মারা অনেক লোক যাচ্ছে।

এই উত্তরে সনতের অত্যন্ত হাসি পাইল, সে হাসিয়া বলিল—অনেক লোক যাচ্ছে বোলেই ত ভিড় আরো বেশীই হবে।

মলিনা লজ্জিত দৃষ্টি তুলিয়া সনৎকে জিজ্ঞাসা করিল—তা হোলে যাব না?

এই প্রশ্নের মধ্যে এমন একটি ক্ষুণ্ণ হতাশার আভাষ শোনা গেল যে সনৎ আর বারণ করিতে পারিল না; বলিল—আমি যেতে বারণ কর্‌ছিনে, তুমি যাও।

শিশু নাগালের বাহিরের কোনো জিনিস কষ্টেস্যষ্টে নানা কৌশলে পাড়িয়া হাতে পাইলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, মলিনাও এই অনুমতি পাইয়া তেমনি প্রফুল্ল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে হাসির আভায় জলজলে চোখ দুটি সনতের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল—আমি ভাত জলখাবার সব রেঁধে বেড়ে ঢেকে রেখে গেলাম; রাঘবকে বল্‌লেই সে দেখিয়ে দেবে।

সনৎ হাসিয়া বলিল—এর মধ্যে অন্নপূর্ণার দুবেলার রান্না হয়ে গেছে?

সনতের প্রীতিপূর্ণ কথার উত্তরে মলিনা দৃষ্টিতে হাসি ও খুসী চল্‌কাইয়া লঘু ক্ষিপ্র পদে নীচে নামিয়া চলিয়া গেল।

আজ চড়ক। তারকেশ্বরের যাত্রীর অন্ত নাই। সন্ন্যাস-ব্রতচারী মেয়েপুরুষ গেরুয়া কাপড় ও গলায় ডুরি পরিয়া দলে দলে ভিড় করিয়া দেবদর্শনে চলিয়াছে। ষ্টেসনে ষ্টেসনে হুড়াহুড়ি, গাড়ির কাম্‌রায় কাম্‌রায় ঠাসাঠাসি, সর্ব্বত্র কোলাহল ও কলহ। নিত্যকার সাধারণ বাঁধা নিয়মের জীবনযাত্রা হইতে স্বতন্ত্র উত্তেজনাপূর্ণ এই নূতন অভিজ্ঞতা মলিনার বেশ ভালো লাগিলেও, এক-একবার তার মনে হইতেছিল আজ না আসিলেই বোধহয় ভালো হইত। গাড়ীর মধ্যে যতগুলা পুরুষ আছে তাদের সকলের চোখই তার রূপে আকৃষ্ট হইয়া চুম্বকের গায়ে লোহার মতন

যেন আঁটিয়া গিয়াছিল; ট্রেনে ওঠার বড় তাড়াতাড়ির সময় ওরই মধ্যে একটু খালি কাম্‌রা খুঁজিয়া লইবার ছুটাছুটির ভিতরেও লোকগুলা সেই কাম্‌রার সাম্‌নে একবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইতেছিল, এবং সেই কাম্‌রায় উঠিবার আগ্রহ সকল যাত্রীরই অধিক দেখিয়া যারা আগে সেই কাম্‌রায় স্থান লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছে তারা ভয়ানক আপত্তি কোলাহল ও কলহ করিতেছিল।

ভিড়ের মধ্যে চিঁড়ে-চেপ্টা হইয়া মলিনা কোনোমতে যখন তারকেশ্বরে গিয়া পৌছিল তখন সেই জনসমুদ্র দেখিয়া মলিনার ভয় করিতে লাগিল; সে শুষ্ক মুখে ত্রস্ত হাতে খুদীর মার আঁচল চাপিয়া ধরিল।

ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়াই খুদীর মা হঠাৎ জিভ কাটিয়া মলিনার হাত হইতে কাপড় ছাড়াইয়া লইয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া দিল এবং বলিয়া উঠিল—ওমা! ডাক্তার-বাবু যে!

মলিনা চারিদিকে চোখ বুলাইতে বুলাইতে উৎসুক হইয়া বলিল—'কৈ?' হঠাৎ মলিনা দেখিল সনৎ ভিড় ঠেলিয়া তাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সনৎকে দেখিয়াই মলিনার সমস্ত অন্তর একটি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুধারসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল—সনৎ তার জন্য এত দূরে নিজের কাজ ফেলিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, এই পরম সৌভাগ্যের গভীর অনুরাগের আনন্দ যেন মলিনাকে নেশার মতন আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। মলিনার মনের আনন্দেরই প্রতিধ্বনির মতন খুদীর মা যখন মলিনাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"ওলো! দেখ্‌ছিস্‌—তোর জন্যে ডাক্তার-বাবু সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসেছে! তোকে ছেড়ে একটা দিনও থাক্‌তে পার্‌ল না!" তখন সেই বিদ্রূপের আঘাতে মলিনার বিরক্তি বা লজ্জা হইল না, তার নিজের অনুমান খুদীর মার কথায় সায় পাইল বলিয়া মলিনার মুখ সুখের দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল।

তাকে দেখিবামাত্র মলিনার মুখের আনন্দ-দীপ্তি সনৎ লক্ষ্য করিল ও তার মানেও বুঝিল। খুদীর মারা গিয়া যে যাত্রীনিবাসে আশ্রয় লইল, সনৎও গিয়া সেইখানেই উঠিল।

পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে মলিনা যখন উপরে উঠিল, তখন তার অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল—সহস্র লুব্ধ চক্ষু তার দেহলাবণ্য পান করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া নয়, মাত্র দুটি চোখ হইতে প্রীতিভরা প্রশংসায় মুগ্ধ দৃষ্টিখানি তার সর্ব্বাঙ্গে প্রণয়পবিত্র চুম্বনের মতন বর্ষিত হইতেছে অনুভব করিয়া।

পূজার আয়োজন করিয়া মন্দিরে যাইতে যাইতে একেবারে বিকাল হইয়া গেল। মলিনা যে এত বেলা পর্য্যন্ত নিজে উপবাসী আছে তার জন্য সে উদ্বিগ্ন নয়, তার মনের মধ্যে কেবল প্রশ্ন উঠিতেছিল—সমস্ত দিন ওঁর খাওয়া হল না? বাড়ী হইলে সে এতক্ষণে শত বার অনুরোধ করিয়া খাওয়াইত, কিন্তু এখানে এত লোকের সাম্নে সনতের প্রতি মমত্ব প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল বলিয়াই মলিনা সনতের কষ্টের কল্পনাতেই অত্যন্ত ব্যথিত ব্যাকুল বোধ করিতেছিল।

তারকেশ্বরের মন্দিরের ভিতর লোকের ভিড় যেন জলস্রোতের ঘুর্ণীতে মোচড় খাইয়া ঢুকিয়াই ধাক্কায় ধাক্কায় বাহির হইয়া আসিতেছিল। মলিনা যখন তারকেশ্বরের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত দুধগঙ্গাজলের ভাঁড় ও ফুল বিল্বপত্র অপর একজন যাত্রীর পিঠের উপর কোনোমতে ফেলিয়া দিয়া ধাক্কায় ধাক্কায় আধমরা হইয়া পাক খাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন তার কাছাকাছি একটাও চেনামুখ সে দেখিতে পাইল না—খুদীর মারা সব কে কোথায় যে ছড়াইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে তার সন্ধানই

নাই। মলিনা ব্যাকুল হইয়া যখন চারিদিকে ফ্যাল্কা-মুখে চাহিতেছে, তখন সনৎ তার হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিল—এস।

হঠাৎ সনৎকে পাশে দেখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া মলিনা বলিল—ওরা সব কোথায় গেল?

সনৎ মলিনাকে ভিড় হইতে একটু ফাঁকায় লইয়া যাইতে যাইতে বলিল—দেখ্‌তে ত পাচ্ছিনে কাউকে।

মলিনা আগ্রহে বলিয়া ফেলিল—ভাগ্যে আপনি এসেছিলেন!

সনৎ শুধু একটু হাসিল।

যখন তারা একটু অগ্রসর হইয়া আসিল, তখন বুঝিতে পারিল কাল-বৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড় হঠাৎ ধূর্জ্জটির মতন ধূলার পিঙ্গল জটা উড়াইয়া উদ্দাম তাণ্ডব জুড়িয়া দিয়াছে। ঝড়ের বেগ খুব, ধূলার ঝাপট প্রচণ্ড, কার সাধ্য বাহিরে যায়। জনস্রোত আড়াল আশ্রয় খুঁজিবার জন্য বিষম ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে। সনৎ দুই হাত দিয়া মলিনাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সমস্ত ধাক্কা নিজের গায়ে লইয়া মলিনাকে বাঁচাইতে লাগিল। খানিকক্ষণ ধাক্কা সহিয়া সহিয়া ক্লান্ত হইয়া সনৎ বলিল—মলিনা, চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি। আঁচলখানা মুখের ওপর ফেলে দাও, চোখে ধূলো লাগ্‌বে না।

সনৎ উড়ানি দিয়া ও মলিনা আঁচল দিয়া চোখ ঢাকিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের বেগের বিরুদ্ধে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, নিকটেই এক দোকান-ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল। ঝড় তখন বাহিরে ডাকিতেছে বোঁ-ওঁ-ওঁ!

অল্পক্ষণ পরেই প্রবল ধারায় বৃষ্টি মেঘগর্জ্জন ও বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল।

এই বৃষ্টি থামে, এই ঝড় কমে, করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গেল।

সনৎ ঘড়ী দেখিল, শেষ ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। খুদীর মারা গেল বা আছে, থাকিলেই বা কোথায় আছে, তাহা খোঁজ করা এখন দুঃসাধ্য; যেখানে হোক মলিনাকে ও তাকে স্বতন্ত্র হইয়া রাত্রি যাপন করিতে হইবে, তাদের কাছে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে'না। সনৎ দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিল—রাতটা থাক্‌বার একটু জায়গা পাওয়া যাবে?

দোকানী আগ্রহের সহিত বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, এইদিকে আসুন আপনাদের একটা নিরিবিলি ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

দোকানী একটা ছাতা আনিয়া সনতের হাতে দিয়া বলিল—এই উঠোনটা পার হয়ে ওধারে যেতে হবে।

দোকনী একটা লণ্ঠন লইয়া ও একটা ঝাঁপি মাথায় দিয়া আগে আগে ছুটিয়া উঠান পার হইয়া অপর দিকের দাওয়ায় উঠিল, এবং তার পিছনে পিছনে সনৎ নিজে ভিজিয়া মলিনার মাথায় ছাতা ধরিয়া কাদায় পিছল উঠানে সন্তর্পণে পা টিপিয়া টিপিয়া পার হইল।

দোকানী ঘরের দরজা খুলিয়া ঘরে আলো রাখিয়া বলিল—এই ঘরে আপনি আর আপনার স্ত্রী বেশ নিরিবিলি থাক্‌তে পার্‌বেন।

সনৎ অপাঙ্গে একবার মলিনার মুখের দিকে চাহিল, মলিনাও ঠিক সেই সময়ে একবার চোরা চাহনি সনতের দিকে ফিরাইয়াছিল, সনতের দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়া মলিনার মুখ লাল হইয়া উঠিল।

দোকানী বলিল—কিন্তু বাবু, ভাড়া পাঁচ টাকা লাগ্‌বে। আর এই মাদুরের ভাড়া লাগ্‌বে পাঁচ সিকে।

সনৎ ভিজে চাদরখানা গালিতে গালিতে বলিল—আচ্ছা, তাই দেওয়া যাবে।

দোকানী হৃষ্ট হইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল—আর কিছু দর্‌কার হলে আমায় ডাক্‌বেন। আজ্ঞে আমার নাম কেবলরাম দাস!

কেবলরাম চলিয়া গেলে সনৎ মলিনার দিকে চাহিয়া হাসিল। মলিনার মুখ প্রগাঢ় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মলিনা ঢোক গিলিয়া কষ্টে উচ্চারণ করিয়া বলিল—আর-একটা ঘরের কথা বল্‌লেন না কেন?

সনৎ মলিনার ভয় দেখিয়া হাসিয়া বলিল—পরে বল্‌লেই হবে। এখনো ত রাত্ত বেশী হয়নি।

মলিনা বলিল—দোকানীকে ডেকে কিছু খাবার আনালে হত, আপনার সমস্ত দিন খাওয়া হয়নি।

সনৎ চেতনা পাইয়া বলিল - তাও ত বটে, আমি ত তবু সকাল বেলা জল খেয়ে বেরিয়েছিলাম, তুমি যে এখনো জলস্পর্শ করোনি।

সনৎ অন্য দিকে চাহিয়া বলিল—আজ যে-আনন্দে মন ভোরে আছে, খিদে-তেষ্টার কথা আর কিছু মনে নেই।......ওহে কেবলরাম! কেবলরাম!......

সনৎ যে কথাটা যেন বলে নাই এমনি করিয়া বলিয়া ফেলিল, তারই লজ্জা এবং সঙ্কোচ চাপা দিবার জন্য সে কেবলরামকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল এবং সে আসিলে তার সঙ্গে খাবার জোগাড়ের ব্যবস্থা করিতে মন দিল।

বৃষ্টি থামিবার নাম নাই—মুষলধারে অবিরল বর্ষণ হইয়াই চলিয়াছে। আহারাদির পর মলিনা ইতস্তত করিয়া সনৎকে বলিল—আপনি আর-একটা ঘরের কথা ত বল্‌লেন না।

সনৎ বলিল—ঘর ঠিক আছে; তুমি দোর বন্ধ কোরে শোও, তার পর আমি যাচ্ছি।

সনৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইল; মলিনাও অগ্রসর হইয়া আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। সনৎ বলিল—তুমি

দরজায় খিল দাও, নইলে তোমায় একলা ফেলে ত আমি যেতে পারিনে।

মলিনা দুটি চোখে লজ্জাভরা প্রীতির কোমল দৃষ্টি সনতের মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। দাওয়ার এক পাশে একখানা হোগ্‌লার চেটাই পড়িয়া ছিল, সনৎ গিয়া তারই উপর বসিল।

মলিনা ঘরের দরজায় খিল দিয়াও শুইতে বা ঘুমাইতে পারিল না, আলোটা সাম্‌নে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একলা এক ঘরে এই বিদেশ অচেনা জায়গায় তার বড় ভয় করিতেছিল; বাহিরে ভয়ানক দুর্য্যোগ, ঝড় বোঁ-ওঁ-ওঁ করিয়া ডাকিতেছে, বৃষ্টিজলের ছাট আর ঝাপ্‌টা ছপ্‌-ছপ্‌-সপাৎ করিয়া ঘরের বেড়ার গায়ে আছ্‌ড়াইয়া পড়িতেছে, মেঘগর্জ্জন মুহুর্মুহু ঘর কাঁপাইয়া তুলিতেছে, এবং থাকিয়া থাকিয়া বজ্রাঘাতের তীব্র আলোক ও ঝঞ্ঝনা একাকিনী ভীরু তরুণীর হৃৎকম্প উৎপাদন করিতেছিল। মলিনার থাকিয়া থাকিয়া মনে হইতেছে যে কেউ যেন আসিয়া তার দরজায় ঘা মারিতেছে, কেউ যেন দরজা খুলিতেছে, কেউ যেন বাহির হইতে তাকে ডাকিতেছে। মলিনা তাই থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কিয়া উঠিতেছিল, ভয়ে তার গা ছমছম করিতেছিল। তখন তার মনে হইতেছিল, কেন সে সনৎকে তাড়াইল? সনৎ কাছে থাকিলে ত তার সাহস থাকিত। কিন্তু তখনই আবার তার মনে হইল—ভালোই করিয়াছে সে।

সনতের কথা মনে করিয়া মলিনা ভাবিতে লাগিল—তিনি কোন্‌ ঘরে আছেন, সে ঘর কোন্‌ দিকে, কত দূরে? সে ঘরে তিনি একলা আছেন, না আরো অনেক লোক আছে? অন্য লোক থাক্‌লে ত ওঁর বড় অসুবিধা হচ্ছে, হয়ত কষ্ট হচ্ছে। ওঁর কাপড় ভিজে গিয়েছিল, সেই ভিজে কাপড়েই আছেন কি? শোবার বিছানা পেলেন কি না? তাঁকে

এই ঘরে থাক্‌তে দিলেই হত, তা হলে আমি তাঁকে দেখ্‌তে পার্‌তাম। আমার জন্যে তিনি এই কষ্টটা পেলেন!

সনৎ তাকে ভালোবাসে এই কথা মনে হইতেই মলিনার মন সনতের দিকে শত বাহু মেলিয়া তাকে নিকটে টানিয়া লইবার জন্য উৎসুক ব্যগ্র হইয়া উঠিতে লাগিল। সনৎ মলিনার জন্য যে কষ্ট সহ্য করিয়া নিজের প্রণয়ের পরিচয় ব্যক্ত করিল, তার সহস্রগুণ কষ্ট স্বীকার করিতে পারিলে যেন মলিনার অনুরাগ ও প্রণয়ের মর্য্যাদা রক্ষা হয়। মলিনা ব্যাকুল হইয়া প্রভাতের প্রতীক্ষায় সনতের সাক্ষাতের অন্য মুহূর্ত্ত গণিতে লাগিল।

বাহিরের ঝড় জল থামিয়া আসিতেছে; বহু বিহঙ্গের মিষ্ট কাকলি উষার মঙ্গল-আরতি গান করিতেছে। ভোর হইয়াছে মনে করিয়া মলিনা আস্তে আস্তে দরজা খুলিয়া বাহিরে উঁকি মারিতেই দেখিল দাওয়ার এক কোণে সনৎ চেটাইএর উপর বসিয়া আছে, সমস্ত রাত্রের বৃষ্টির ছাটে ছাটে তার জামা কাপড় ভিজিয়া শপশপ করিতেছে! ইহা দেখিয়াই মলিনার চোখের পাতা সুখের আবেশে ভিজিয়া উঠিল। সনৎ মলিনাকে দরজা খুলিতে দেখিয়াই হাসিমুখে উঠিয়া তার কাছে আসিয়া বলিল—ঘুম ভাঙ্‌ল?

মলিনা অতি সুখের লজ্জায় জড়িত স্বরে বলিল—আমি ত ঘুমুইনি। আপনি কি সমস্ত রাত ঐখানে বোসে ভিজ্‌ছিলেন?

সনৎ হাসিয়া বলিল—কি আর করি! তুমিই ত ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে।

লজ্জায় ব্যথায় কাতর হইয়া মলিনা মৃদু স্বরে বলিল—আপনি যে বল্‌লেন অন্য ঘর ঠিক করেছি।

সনৎ বলিল—ওরা মনে করেছিল তুমি আমার স্ত্রী। ওদের সে ভুল ভাঙ্‌তে ইচ্ছে হল না। আমি যদি বল্‌তাম তুমি আমার স্ত্রী নও, তা হলে ওরা যা ভাব্‌ত সেটা তোমার বা আমার কারোই সম্মানের কারণ হত না।

মলিনা সনতের এই কথার তাৎপর্য্য সহজেই বুঝিতে পারিল; সে ত গাড়ীতে ষ্টেসনে যাত্রীদের বাসায় দেখিয়াছে এখানে যে-সব পুরুষ ও মেয়ে আসিয়াছে তাদের অধিকাংশ কোন্ শ্রেণীর লোক। সেই অপমানকর অনুমান থেকে বাঁচাইবার জন্য সনতের এই ক্লেশ স্বীকার! মলিনার দুই চোখের বড় বড় ঘনকৃষ্ণ পক্ষ্মজাল হইতে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সনৎ হাসিমুখে বলিল—আমার কষ্টের চেয়ে পুরস্কার অনেক বেশী হয়েছে মলিনা, তুমি কিছু মনে কোরো না।

মলিনা প্রবল সুখের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সনৎ মলিনার মাথায় পরম স্নেহের সম্মান-সম্ভ্রমে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে হাসিমুখে বলিল—আর-একবার দেবতা দর্শন কোরে নেবে ত স্নান কোরে নাও, সকাল-সকাল প্রথম গাড়ীতেই ফেরা যাক।

মলিনা সনৎকে প্রণাম করিয়া বলিল—আর অন্য ঠাকুর দেখ্‌তে যাব না। কল্‌কাতায় ফিরে চলুন।

সনৎ খুদীর মাদের অনেক খুঁজিল, কোথাও তাদের দেখিতে পাইল না। তখন সে মলিনাকে লইয়া দুখানি সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিল। সেই গাড়ীতে আসিয়া উঠিল সনতের পরিচিত এক ব্যক্তি, সঙ্গে তার গুটিকয়েক নর্ত্তকী গায়িকা। গাড়ীতে তাদের উঠিতে দেখিয়াই মলিনা জড়সড় হইয়া ঘোমটা টানিয়া বসিল। সনৎ সরিয়া গিয়া

তার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। আগন্তুক লোকটি সনৎকে বলিল—এই যে ডাক্তার-বাবু, আপনি এসেছিলেন দেখ্‌ছি—সস্ত্রীক নাকি?

সনৎ শুধু বলিল—হ্যাঁ।

মলিনার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। সনতের বার বার এই মিথ্যা কথায় সনতের উপর তার অত্যন্ত রাগ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ীতে যে বেলেল্লা কাণ্ড আরম্ভ হইল তাতে মলিনা বুঝিতে পারিল সনৎ তাকে তার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া কী মহৎ অপমান থেকে রক্ষা করিয়াছে। তখন তার মন জুড়িয়া শুধু প্রতিধ্বনি হইতেছিল একটি প্রশ্নের অতি সংক্ষিপ্ত অসঙ্কোচ উত্তরটুকু—সস্ত্রীক নাকি? হ্যাঁ! তার মনে হইতে লাগিল এই মিথ্যা কথা যেন তার জীবনকে সার্থক মধুময় করিয়া তার পরম সৌভাগ্যকে চরম পুরস্কার দিয়া চুকিল; তার মস্তকে সনতের যে হস্তস্পর্শ সে লাভ করিয়াছে তাতেই তার নারীজন্ম ধন্য হইয়াছে।

(১৬)

মলিনা বাসায় ফিরিয়া অভিমান-ক্ষুব্ধ আহত স্বরে খুদীর মাকে বলিল—তোমরা ত বেশ লোক মাসা! আমাকে একলা ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চোলে এলে! ভাগ্যে ডাক্তার-বাবু ছিলেন, নইলে আমি কি বিপদেই পড়্‌তাম!

খুদীর মা ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ লো নেকি হ্যাঁ! আমরা তোকে ফেলে এলাম, না তুই ছুঁড়ি ডাক্তার-বাবুর সঙ্গে সট্‌কে পড়্‌লি! শাগ দিয়ে আর মাছ ঢাকিস্‌নে লো!

মলিনা অপমানে লাল হইয়া সেখান থেকে সরিয়া আসিল। তার একবার রাগ হইল সনতের উপর—কেন উনি তার সঙ্গে-সঙ্গে গিয়াছিলেন। পরক্ষণেই তার সেই রাগ রহিল না—ভাগ্যে উনি গিয়াছিলেন,

তাই ত রক্ষা! নহিলে কি বিপদই না ঘটিতে পারিত! আরো এই তীর্থযাত্রায় সে যে-সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সনৎ না গেলে ত তার ভাগ্য হয়ত আমরণ বঞ্চিত মরুভূমি হইয়াই থাকিত।

মলিনা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাঘবকে বলিল—রাঘব, কাল থেকে বাবুর খাওয়া হয়নি। রাঁধ্‌তে ত দেরী হবে, তুমি কিছু খাবার কিনে আনো চট্‌ কোরে।

রাঘব বলিল—বাবুর ত জ্বর হয়েছে।

—অ্যাঁ! জ্বর হল!—বলিয়া মলিনা তাড়াতাড়ি সনতের কাছে চলিল। এত সহজে বিনা আহ্বানে বা অপ্রয়োজনে সে এর আগে কখনো সনতের কাছে যায় নাই। সনতের জ্বর হইয়াছে শুনিয়াই মলিনার মনে হইল—এর কারণ সে! তার জন্য সনৎ সমস্ত রাত জলে ভিজিয়া এই জ্বর করিয়াছে। মলিনার মন স্নেহাতুর প্রণয়ব্যাকুল ব্যস্ততায় এমন হঠাৎ ভরিয়া উঠিল যে সনতের কাছে যাওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে ভাবিয়া ইতস্তত করিবারও অবসর সে পাইল না। মলিনা সনতের ঘরের দরজার কাছে পৌঁছিয়াই দেখিল সনৎ চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া আছে, ঘন ঘন জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে, মুখ চোখ লাল থম-থম করিতেছে। ইহা দেখিয়া সে আর তার অভ্যাসমত দরজার কাছেই দাঁড়াইল না, একেবারে সনতের খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া তার সদ্যস্নানশীতল কোমল করতল সনতের কপালের উপর রাখিল। সেই সুখস্পর্শে আরাম বোধ করিয়া সনৎ "আঃ!" বলিয়া চোখ খুলিল—তার দুই চোখ রক্তের আধিক্যে জবাফুলের মতন রাঙা।

মলিনা বলিল—খুব বেশী জ্বর হয়েছে যে।

সনৎ হাসিয়া বলিল—তোমার সেবা পাবার লোভে।

মলিনা যেন সে কথা শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে বলিল—গায়ে একটা কিছু ঢাকা দিয়ে দেবো কি ?

সনৎ চোখ বুজিয়া অস্পষ্ট ভাবে বলিল—হ্যাঁ দাও, শীত কর্‌ছে।

মলিনা সনতের গায়ে একখানা কম্বল ঢাকা দিয়া পাখা লইয়া মাথায় হাওয়া দিতে লাগিল।

সনৎ বলিল—কাল থেকে কিছু খাওনি মলিনা, তুমি যাও খাওগে। রাঘবকে বোলে দাও একটু বরফ এনে আমার মাথায় দিক্‌—মাথায় বড় রক্ত উঠ্‌ছে—আমার জ্ঞান বুদ্ধি সব আচ্ছন্ন হয়ে আস্‌ছে।

মলিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া রাঘবকে বরফ আনিতে পয়সা দিল এবং বলিয়া দিল—বরফ এনে তুমি কিছু কিনে খেয়ো, আজ আর রান্না হবে না।

সন্ধ্যার সময় সনতের যখন চেতনা হইল, তখন সে অনুভব করিল কেউ একজন তার মাথায় আইস্‌-ব্যাগ দিতেছে। সনৎ ডাকিল—রাঘব।

মলিনা সনতের মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল—কেন? রাঘবকে ডাক্‌ব কি ?

সনৎ মলিনার সাড়া পাইয়া তৃপ্তি অনুভব করিল; পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল—না, সে ষ্টুপিডকে ডেকে কি হবে। বড় গরম হচ্ছে, ঢাকাটা খুলে দাও।

মলিনা ঢাকা খুলিয়া দিল।

সনৎ বলিল—অসুখের সময় আপনার লোককেই কাছে পেতে ইচ্ছে করে। চাকর-বাকরের যত্নে মন ভরে না।

মলিনার মনের মধ্য দিয়া একটা জ্বালার ঝলক বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের

মতন নিমেষে বহিয়া গেল। সে জোর করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বলিল—তাহলে আপনার বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দেবো কি?

সনৎ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—আঃ না। তুমি কিচ্ছু বুঝ্‌তে পারো না।

মলিনা এই তিরস্কারে কৃতার্থ হইয়া গেল—এতখানি সৌভাগ্য জন্ম-হতভাগিনী তার, এ কথা সে বুঝিবে বিশ্বাস করিবে কোন্ সাহসে! তার মন কিন্তু এই সৌভাগ্যের পরিচয়ে ভয় পাইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল—ওরে হতভাগিনী, এত সুখ তোর অদৃষ্টে সহিবে না, সহিবে না।

সনৎ বলিল—আমায় একটা কাগজ কলম দাও ত।

মলিনা কাগজ কলম আনিয়া দিল; সনৎ লিখিল—

প্রিয়তমাসু,

সুবাস, একটা কলে মধুপুর চল্‌লাম, মাস-খানেক দেরী হবে হয়ত।

তোমার সনৎ।

সনৎ চিঠিখানা মলিনার হাতে দিয়া বলিল—এখানা আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দাও।

অতিমাত্রায় আনন্দিত হইয়া মলিনা রাঘবকে বলিল—এই চিঠিটা মোটর-ড্রাইভারকে দাওগে, বাবুর বাড়ীতে দিয়ে অস্‌বে।

চিঠি হাতে লইয়া রাঘব বলিল—আজ কি কিছু খাবে না বামুন-দিদি? তুমি ঠায় উপোস কর্‌বে?

সনৎ চোখ মাথার দিকে তুলিয়া মলিনাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—সমস্ত দিন না খেয়ে বোসে আছ! অমন কর্‌লে আমি বাড়ী চোলে যাব। তুমি খেয়ে এস—যাও।—যাচ্ছ?

পুরুষে মেয়েকে খাইতে অনুরোধ করিলে মেয়েরা অত্যন্ত লজ্জা অনুভব করে; তারা যেন অন্নপূর্ণা, ভিখারী শিবকে অন্ন ভিক্ষা দিয়াই তারা তুষ্ট। তাদেরও যে খাওয়ার দরকার আছে, ইহা তারা পেটুক পুরুষের কাছে স্বীকার করিতে চায় না। সনতের জেদ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই মলিনা খাইতে চলিয়া গেল। নিজে খাইয়া, রাঘবকে খাওয়াইয়া, সনতের জন্য একটু দুধ-সাগু করিয়া সে উপরে আসিতে আসিতে বলিল—রাঘব, আজ আমি বাবুর ঘরে থাক্‌ব, তুমিও ওপরে বারান্দায় শুয়ো।

পরদিন সকালে খুদীর মা মলিনাকে জিজ্ঞাসা করিল—কাল রাত্রে কোথায় ছিলি লো?

খুদীর মার জিজ্ঞাসার ভঙ্গীতে জ্বলিয়া গিয়া মলিনা বলিল—চুলোয়।

খুদীর মা বক্র ঠোঁটে হাসি টিপিয়া বলিল—চুলোতেই বটে!

মলিনা বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল, সনৎকে ছাড়িয়া কোথাও ত সে বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিতেছিল না; লোকে যতই বিদ্রূপ করুক বা মন্দ ভাবুক, তার মন সনতের কাছেই পড়িয়া ছিল, সে দূরে থাকিবার কথা মনে আনিতেও পারিতেছিল না।

সনতের প্রবল জ্বর, একজ্বরী হইয়া আছে; মাথার যন্ত্রণায় অঘোর অচৈতন্য, মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছে। সনৎ থাকিয়া থাকিয়া জ্বরের ঘোরে গান করিয়া উঠিতেছিল—বারম্বার একটি গানেরই একটি কলি—

"আমায় একটু কেবল বস্‌তে দিয়ো কাছে,
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে;
হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে,
আমি সাঙ্গ কর্‌ব পরে।

না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত,
ফিরি কূলহারা সাগরে!"

এই ব্যাকুল প্রার্থনা যে কার কাছে তাহা মলিনা বুঝিতে পারিতেছিল বলিয়াই আরো সে সনৎকে ছাড়িয়া নড়িতে পারিতেছিল না। সে রাঘবকে ডাকিয়া বলিল—রাঘব, একজন ডাক্তার ডাক্‌তে হবে যে। একবার পরিতোষ-বাবুকে ডেকে আন্‌লে হত।

সনৎ আসা অবধি পরিতোষ আর এ-মুখো হয় নাই। সনৎ পীড়িত অচৈতন্য এবং মলিনা তাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সে অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরিতোষ মাথায় খুব করিয়া তেল মাখিয়া বড় বড় চুল মাথার সঙ্গে চাপিয়া প্লেন করিয়া পালিশ করিয়াছে, সার্টের উপর মিহি পাতলা কাপড় ও তার উপর একটি কালো আল্‌পাকার খাটো কোট পরিয়াছে। তার বিশ্বাস এই পরিপাটি প্রসাধন রমণীচিত্তজয়ের অনিবার্য্য অস্ত্র। সে আসিয়াই সনৎকে বলিল—বেশ আছ বাবা! দিব্যি ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তোফা চেহারা, খাসা অদৃষ্ট, সৌখীন অসুখ—বেশ আছ বাবা!

সনৎ একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া পরিতোষের দিকে পিছন ফিরিয়া শুইল। মলিনা বিরক্তি ও লজ্জা চাপিয়া বলিল—বড্ড জ্বর হয়েছে, কাল থেকে জ্বর ছাড়েনি, অচৈতন্য হয়ে থাক্‌ছেন, নয় ভুল বক্‌ছেন। সাহেব-ডাক্তারকে একবার ডাক্‌লে হত।

পরিতোষ উঠিয়া কৃতার্থতার অভিনয় করিয়া চাপা স্বরে বলিল—তুমি হুকুম কর্‌লে আগুনে প্রবেশ কর্‌তে পারি। "পদ্ম-আঁখি আজ্ঞা দিলে......"

মলিনার মুখ বিরক্তিতে ভ্রূকুটিকুটিল ও উগ্র হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়াই নীলকমলের গানের নাকী সুর থামাইয়া পরিতোষ বোঁ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পরিতোষ ফিরিল একেবারে সাহেব-ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া।

সাহেব-ডাক্তারকে ভিজিট দিতে হইল না বটে; কিন্তু ঔষধ-পথ্যের খরচ ত আছে। মলিনার কাছে সংসার-খরচের জন্য সনৎ যে টাকা দিয়া রাখিয়াছে তার অর্দ্ধেক ত খরচ হইয়া গেছে, এখনো অর্দ্ধেক মাস ত পড়িয়াই আছে। মলিনা চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল—ওষুধ আন্‌তে কত লাগ্‌বে?

পরিতোষ বলিল—সে জন্যে তোমার কিছু ভাব্‌না নেই, আমি সব ঠিক কোরে দিচ্ছি।

পরিতোষের এই আশ্বাসের যে কি মূল্য, মলিনা তা পুঁটির অসুখের সময় টের পাইয়াছিল—পুঁটির চিকিৎসার সমস্ত খরচই সনতের নামে ধারে হইয়াছিল, পুঁটির মৃত্যুর পর সনৎকে সেই সমস্ত ধার শোধ করিতে হইয়াছে। কাজেই মলিনা বলিল—না, আপনাকে ধারে আন্‌তে হবে না, কি লাগ্‌বে বলুন।

পরিতোষ মলিনার কথায় একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া মলিনার নিকট হইতে টাকা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

পরিতোষ চলিয়া গেলে মলিমা নিজের হাত হইতে সনতের দেওয়া সোনার চুড়ি খুলিয়া রাঘবের সাম্‌নে ধরিয়া বলিল—রাঘব, এই চুড়ি ক'গাছা বেচে হোক কি বাঁধা দিয়ে হোক, আমাকে কিছু টাকা এনে দিতে পারো?

রাঘব আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—টাকা কি হবে বামুন-দিদি?

—বাবুর অসুখ, খরচপত্তর আছে ত।

—বাবুর ঠেঞে চেয়ে নিলেই ত হয়।

—না, এ অসুখের সময় ওঁকে টাকা-পয়সার কথা বোলে ত্যক্ত করা কেন?

—তবে পোষ্টাপিসে আমার ত্বকুড়ি তিন টাকা জমা আছে, আমি উৎরে এনে দেবো আজ।

সনতের জন্য কঠিন ত্যাগ, কঠোর দুঃখ স্বীকার করিতে মলিনার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। রাঘব যে তাকে জিতিয়া যাইবে এই সম্ভাবনাতেই সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—না না, তুমি এই চুড়ি নিয়ে যেখান থেকে হয় টাকা নিয়ে এস।

রাঘব মলিনার জেদ দেখিয়া, মাত্র দুগাছা চুড়ি লইয়া বলিল—এখন এই বাঁধা দি, পরে দরকার হলে আবার আন্‌লেই হবে।

রাঘব সেই চুড়ি দুগাছি নিজের কাছে রাখিয়া পোষ্ট-আফিস হইতে তার জমা টাকা তুলিয়া আনিয়া দিল।

সাহেব-ডাক্তার সনৎকে দেখিতে আসিলে মলিনা পরিতোষকে ডাকিয়া বলিল—ডাক্তারকে বলুন পর্‌শু সমস্ত রাত জলে ভিজে অসুখ করেছে।

পরিতোষ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—জলে ভিজ্‌ল কোথায়?

—তারকেশ্বরে।

—তারকেশ্বরে? আর কে গিয়েছিল? সনতের যে দেবদ্বিজে এমন ভক্তি আছে, তা ত আগে জানা ছিল না? হঠাৎ এমন ভক্তির কারণ কি?

মলিনার আকণ্ঠ লাল হইয়া উঠিল, সে লজ্জায় মুখ নত করিল, হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

তাহা দেখিয়া পরিতোষ পানের-ছোপ-ধরা বড় বড় দাঁত বাহির

করিয়া বলিল—তুমি গিছ্‌লে বুঝি? ও! সনৎকে এতক্ষণ শৈব মনে কর্‌ছিলাম, এখন দেখ্‌ছি সে ঘোরতর শাক্ত! দেবার চেয়ে দেবীর ওপরেই টান বেশী হবারই ত কথা!……

মলিনা বিরক্ত হইয়া উষ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল—ডাক্তার চোলে যাবে, আপনি ওঁকে বলুনগে আপনাকে যা বল্‌তে বল্‌লাম।

পরিতোষ ক্রূর কটাক্ষে ও বিদ্রূপদিগ্ধ চাপা হাসিতে মলিনাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল।

(১৭)

চোদ্দ দিন পরে সনৎ আজ অন্ন পথ্য করিবে। ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া মলিনা পথ্য রাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। সে রান্না চড়াইয়া ছুটিয়া একবার উপরে দেখিতে আসিল সনতের ঘুম ভাঙিয়াছে কি না। মলিনা দেখিল সনৎ জাগিয়া শুইয়া আছে। মলিনাকে আসিতে দেখিয়াই সনৎ একটু হাসিল। মলিনার মুখে সেই হাসি সুন্দরতর হইয়া প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—মুখ ধুয়ে একটু কিছু খান।

মলিনা ডাবর, জলের ঘটী, মাজন ইত্যাদি আনিয়া সনতের বিছানার পাশে টুলের উপর রাখিতে লাগিল। সনৎ এই প্রেমময়ী সেবিকার ক্ষিপ্র লীলাসুন্দর চলাফেরার গতিচ্ছন্দ দেখিতে দেখিতে আনন্দিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—মলিন, অসুখ হয়েছিল আমার, না তোমার? ✓

মলিনার বুকের ভিতরকার সুখসাগর উদ্বেল তরঙ্গে তার মনের তটে ফেনশুভ্র হাসির রেখার মালা পরাইয়া দিয়া গেল, 'মলিন' ডাকের মধ্যে সনতের অনুরাগ আজ যে প্রথম অঙ্গ ধরিয়া প্রকাশ পাইল! মলিনা ঐ প্রীতিসুন্দর সম্বোধনে উৎফুল্ল ও প্রশ্নের রহস্যরসে কৌতুকী হইয়া বলিয়া উঠিল—বাবাঃ! যে অসুখ হয়েছিল আপনার!………

সনৎ হাসিয়া বলিল—আমার অসুখ হয়েছিল? তবে তুমি এত রোগা কালো বিশ্রী হয়ে গেছ কেন?

মলিনার গলা পর্য্যন্ত যতটুকু অঙ্গ অনাবৃত ছিল সুখের লজ্জায় গোলাপী হইয়া উঠিয়া সনতের চক্ষে উষার উন্মেষসৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলিল। সনৎ মলিনার একখানি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

মলিনাও সনতের তন্ময়তায় অভিভূত হইয়া সনতের হাতে বন্দী হাত রাখিয়া লজ্জাসুখে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

সনৎ মলিনার হাত লইয়া দেখিতে দেখিতে বলিয়া উঠিল—তোমার হাতের তুগাছা চুড়ি কি হল?

মলিনা লজ্জায় থতমত খাইয়া বলিল—খুলে রেখেছি।

মলিনার সঙ্কুচিত থতমত ভাব দেখিয়া সনৎ মলিনার হাতখানি নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল—কেন খুলে রেখেছ মলিন? তুমি পোরে এসে আমায় খেতে দাও, নইলে আমি খাব না।

মলিনা মুস্কিলে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—চুড়ি তুগাছা এখন আমার কাছে নেই।

সনৎ আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার কাছে নেই? তবে কি হল?

মলিনা অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে মনে করিয়াছিল তুগাছা চুড়ি কম সনৎ লক্ষ্য করিবে না, এবং লক্ষ্য করিলেও প্রশ্ন করিবে না; কিন্তু এখন তার জেরায় সে একদিকে যেমন তার প্রতি সনতের লক্ষ্য দেখিয়া সুখী হইতেছিল অন্যদিকে নিজের মুখে সনতের প্রতি তার অনুরাগের পরিচয় দিতে লজ্জায় কথা সরিতেছিল না।

সনৎ অভিমানক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল—থাক্, তোমার গোপন কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

সনৎ মলিনার হাত হঠাৎ ছাড়িয়া দিল, অমনি হাতখানি সনতের কোলের কাছে ভূষণশিঞ্জনে আর্ত্তনাদ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।

সনতের এই অভিমানের অনাদর আদরের চেয়েও প্রবল বেগে গিয়া মলিনার মনে আঘাত করিল, সুখের দুঃখে তার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল, সে গাঢ় স্বরে বলিল—আমি বাঁধা দিয়েছি।

সনৎ আরো আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিল—তোমার এমন কি অভাব পড়েছিল যে চুড়ি বাঁধা দিতে হল?

সনতের জন্যই যে তার এই ত্যাগস্বীকার ইহা সনতের কাছে স্বীকার করিতে তার অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল, কিন্তু না বলিলেও সনৎ রাগ করিবে, তাই চেষ্টা করিয়া অনেক কষ্টে বলিল—আপনার অসুখের সময় ওষুধটষুধ.........

মলিনা সমস্ত কথাটা শেষ করিতে পারিল না; লজ্জায় লাল হইয়া মাথা নত করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সনৎ ঝুঁকিয়া তার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—আমাকে বল্‌লেই ত হত টাকার কথা!.........বলোনি ভালোই করেছ মলিন, তা হলে তোমার এই ভালোবাসার পরিচয় ত আমি পেতাম না!

সনৎ মুগ্ধ ব্যগ্র হৃদয়োচ্ছ্বাসকে আর দমন করিতে না পারিয়া দুই হাতে মলিনার হাতখানিকে দুই হাতের মুঠির ভিতর চাপিয়া ধরিয়া প্রগাঢ় আবেশে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মলিনা একটুক্ষণ পরেই হাতখানিকে মুক্ত করিয়া লইয়া নীচে চলিয়া গেল; তার অন্তরে সুখের আগুন তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তারই আভা তার সর্ব্বাঙ্গে লালিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেই আগুন

নিভাইবার জন্য তার চোখ দিয়া অশ্রুধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। আজ মলিনার নিজেকে দেবতার চরণে উৎসর্গ-করা নির্ম্মাল্যের মতন পরম পবিত্র—শ্রদ্ধায় ভয়ে সম্মাননীয় মনে হইতেছিল, যে হাত সনতের হাতের মধ্যে আবেশে নিপীড়িত হইয়াছে তাহা যেন দেবতার মহাপীঠ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সে যে নিজেকে লইয়া কোথায় রাখিবে কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। দেবতার মন্দিরে গিয়া পূজারিণী একদিকে যেমন অনুভব করে যে, সেখানে দেবতার আশীর্ব্বাদ পূজারিণীকে কৃতার্থ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, তেমনি আবার এতটুকু ত্রুটিতে দেবতার রোষের ভয়েও তার মন ছম্‌ছম্‌ করিতে থাকে, মলিনারও তেমনি আনন্দ ও ভয় মিশিয়া মনকে উতলা করিয়া তুলিতেছিল। ভক্ত যেমন দেবনির্ম্মাল্য লইয়া কোথায় রাখিবে ঠিক করিতে না পারিয়া ভয়ে ভক্তিতে সম্ভ্রমে ইতস্ততঃ করে, মলিনার মনও তেমনি নিজেকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। শতদল পদ্ম যেমন দলের পর দলের স্তবক খুলিয়া খুলিয়া অন্তরের বন্দী সুষমা ও সুবাসের গোপন ঐশ্বর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রকাশ করিতে থাকে, মলিনাও তেমনি আপনার নারীজীবনের মাধুর্য্য প্রতিদিন অল্পে অল্পে অনুভব করিয়া নব নব অভিজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া উঠিতেছিল; তার নিজের মধ্যেই যে এমন বিচিত্র পরম আনন্দ সুপ্ত হইয়া ছিল, ইহা জানিয়া তার আর বিস্ময়ের অবধি থাকিতেছিল না।

রাঘব বাবুকে মুখ ধোবার জোগাড় করিয়া দিবার জন্য উপরে আসিয়া দেখিল সমস্ত আয়োজনই হইয়া গেছে, সনৎ মুখ ধুইতেছে। রাঘব তাড়াতাড়ি আসিয়া সনতের হাত হইতে ঘটী লইয়া তার হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল।

সনৎ মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল—হ্যাঁরে রোঘো, তুই বামুন-দিদির

চুড়ি বাঁধা দিয়ে এলি কোন্ আক্কেলে হতভাগা! আমায় টাকার কথা বল্‌তে পারিসনি।

রাঘব তার মিশকালো মুখে দইএর মতন শাদা পাকা ছাঁটা গোঁপের তলায় মাঝে মাঝে ফোক্‌লা শ্রেণীভঙ্গ দাঁত বাহির করিয়া বলিল—আমি ত চুড়ি বাঁধা দিইনি বাবু, দিদিমণি জেদ্ করতে লাগ্‌ল তাই দুগাছা চুড়ি নিয়ে আমার কাছেই রেখে দিয়েছি।

সনৎ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—তবে টাকা কোথায় পেলি?

রাঘব তেমনি ভাবেই দাঁত বাহির করিয়া বলিল—আজ্ঞে পোষ্ট-আপিসে আমার দুকুড়ি টাকা জমা ছিল, তাই উৎরে এনে দিয়েছিলাম।

ভৃত্যের মমতায় মুগ্ধ হইয়া, ভারি গলায় সনৎ জিজ্ঞাসা করিল—আমি যদি মোরে যেতাম রাঘব?

রাঘবের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, তার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, সে ঢোক গিলিয়া উদ্‌গত অশ্রু দমন করিয়া বলিল—আপনার পেরাণটাই যদি যেত তার কাছে ঐ কটা টাকা ত তুচ্ছু বাবু! ঐ টাকা আপনারই দেওয়া, আপনারই সেবায় লেগেছে!

সনৎ ভারি স্বরে বলিল—তোদের মতন চাকর যার, তার বড় সৌভাগ্য!

মলিনা একখানি রেকাবিতে রোগীর জলখাবার সাজাইয়া লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে সনতের শেষ কথা কয়টি শুনিতে পাইল।

(১৮)

সুবাসিনী পনেরো ষোল দিন স্বামীর সাক্ষাৎ পায় নাই; মাঝে মাঝে সে সনতের চিঠি পাইয়াছে, সনতের ফিরিতে এখনো দেরি আছে। সুবাসিনী ইংরেজি জানিত না; কলিকাতা হইতে যে চিঠি মধুপুরের মিথ্যা ঠিকানা লইয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাকে ফাঁকি দিত, তার উপরে

যে ইংরেজিতে কলিকাতার ছাপ আছে তাহা সে সন্দেহও করিত না। কিন্তু সে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিতেছিল। সে যে নিতান্ত একলা; স্বামীর অদর্শনে তাই তার অত্যন্ত বেশী-রকম অভাব ও ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতেছিল। তার উপর এই ছয় মাস ধরিয়া তার স্বামী যেন ক্রমশ তাকে ছাড়িয়া দূর হইতে দূরে দ্রুত সরিয়া চলিয়া যাইতেছে; তার পাশে থাকিলেও তাকে নিকটস্থ মনে হয় না, সে যেন কোন্ দূর দিগন্তের জ্যোতিষ্ক, তার জ্যোতি এখন নিঃশেষে নিভিয়া গিয়াছে; এখন তাকে দেখিতে হইলে দূরবীন কষিয়া অনুসন্ধান করিয়া তবে তার ঠিকানা পাইতে হয়। প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া সুবাসিনী আশা করে আজ তার স্বামী আসিবে; তার পর প্রতীক্ষায় প্রত্যেক মুহূর্ত্ত গণিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে দীপ নিভাইয়া সে ঘুমাইয়া পড়ে তার স্বামীকেই স্বপ্ন দেখিবার জন্য।

অসুখ হইতে উঠিয়া সনৎ স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া চিঠি লিখিয়াছে, সে শীঘ্রই এইবার বাড়ী ফিরিবে। আজ পথ্য করিয়া সনৎ স্থির করিল বাড়ী যাইতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হইবে না, শেষে কোন্‌দিন বা সুবাসিনী হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইবে। মলিনার প্রতি সনতের ভালোবাসা ও অনুরাগ যত গভীর ও প্রবল হইতেছিল, স্ত্রীর কাছে তার সম্বন্ধে একটা সঙ্কোচ ও গোপনের প্রয়াস সনতের মনে ততই বাড়িয়া চলিতেছিল। স্ত্রীর নিকট হইতে মলিনার কথা গোপন রাখিবার মতন কোনো কারণই ছিল না; অধিকন্তু সে তার স্ত্রীকে স্নেহময়ী ক্ষমাশীলা এবং স্বামীর প্রণয় ও সততার প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণা বলিয়া জানিত; সুতরাং সরল ভাবে সুবাসিনীকে মলিনার কথা বলিলে সে কখনোই তার প্রতি হিংসা করিত না, বরং তাকে সহোদরার আদরে নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখিত। কিন্তু মলিনাকে

প্রথম দর্শন অবধি তাকে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া নিজের কাছে পাইবার আনন্দের লোভ সনতের মনে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে তাকে স্ত্রীর কাছে লইয়া গিয়া তাকে তার স্ত্রীর আড়ালে প্রচ্ছন্ন অপ্রধান করিয়া ফেলিবার আশঙ্কা তাকে সে প্রবৃত্তিই দ্যায় নাই। প্রথমেই যাহা প্রকাশ করা হয় নাই, তার গোপনতার আবশ্যকতা যত পুরাতন হইতেছিল ততই বেশী হইতেছিল; মলিনার বিষয় সনতের কাছে এখন লজ্জা ও ভয়ের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল, এবং যতই মলিনার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিষিদ্ধ ও অস্বীকার্য্য মনে হইতেছিল, সনতের মন মলিনার প্রতি ততই ব্যাকুল আগ্রহে ধাবিত হইয়া অকস্মাৎ হারাইবার ভয়ে তাকে স্নেহ অনুরাগ ও প্রণয়ের শত বেষ্টনে জড়াইয়া ধরিতেছিল। মলিনাকে একান্ত নিজস্ব গোপন সামগ্রী করিয়া রাখিবার জন্যই সনৎকে সম্প্রতি তাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, অথচ তাকে ছাড়িয়া যাইবার বেদনাও এ বিচ্ছেদকে সুদুঃসহ করিয়া তুলিতেছিল। সনৎ অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া মলিনাকে বলিল—মলিন, তোমায় ছেড়ে কোথাও নড়্‌তে ইচ্ছে করে না কেন বলো ত?

মলিনার সর্ব্বাঙ্গে যেন গোলাপফুল ফুটিয়া উঠিল। সে লজ্জিত নত মুখে ঈষৎ হাসি মাখাইয়া অরুণ-বেলার গোলাপফুলটির মতন মিঠা স্বরে মৃদু গুঞ্জনে বলিল—কোথায় যাবেন এই কাহিল শরীরে?

সনৎ একটু ঝুঁকিয়া মলিনার হাত ধরিয়া তাকে কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল—একবার বাড়ী না গেলে ত আর চলে না।

মলিনার দীপ্ত মুখশ্রী হঠাৎ নিষ্প্রভ মলিন হইয়া গেল, যেন বর্ষাকালের অরুণোদয় ঝড়ো মেঘের হঠাৎ আগমনে ঢাকিয়া গিয়া রাত্রির অন্ধকারকেই ডাকিয়া আনিল। মলিনা বলিল—এই দুপুর রোদ্দুরে যাবেন? বিকেলে গেলে হত না?

সনৎ বলিল—বিকেলে গেলে আজ আর আস্‌তে পাব না, তাই এখন যাচ্ছি, বিকেলে আবার ফিরে আস্‌তে পার্‌ব।

মলিনার মুখের ম্লানিমা আবার দূর হইয়া তার মুখ প্রসন্ন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, অকস্মাৎ তার কথায় বাধা দিয়া দরজার কাছ হইতে পরিতোষ বলিয়া উঠিল—বেশ আছ বাবা!

পরিতোষ জুতা চাপিয়া চাপিয়া নিঃশব্দে কখন উপরে উঠিয়া আসিয়াছে তাহা সনৎ বা মলিনা কেউ টের পায় নাই। সনৎ তাড়াতাড়ি মলিনার হাত ছাড়িয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল; মলিনার মুখের উপর কে যেন এক কৌটা সিঁদুর ঢালিয়া দিল, সে আরও একটু ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

পরিতোষ পানের ছোপে সাতরঙা লম্বা লম্বা দাঁত বাহির করিয়া সনৎ ও মলিনার দিকে তাকাইয়া উভয়কে লক্ষ্য করিয়াই বলিল—অসময়ে এসে পড়েছি, মাপ কোরো তোমরা। আমি বল্‌তে এসেছিলাম সনৎ—ডালিমের বোন আঙুরের বড় অসুখ, ডালিম তোমায় ডাক্‌তে বললে......

মলিনার সাম্‌নে ঐসব অভদ্র লোকের নাম উত্থাপন করাতে বিরক্ত হইয়া সনৎ বলিল—রোগী দেখে বেড়াবার মতন আমার শরীরের অবস্থা এখনো হয়নি। অধিকন্তু আমি এখন বাড়ী যাচ্ছি।

পরিতোষ নখের উপর একটা সিগারেট ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল—ঐ দিক দিয়ে একবার দেখে গেলে হত, হাজার হোক ওরা তোমার পুরোনো আলাপী।

মলিনা মুখ লাল করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল; সিঁড়িতে নামিতে নামিতে শুনিল সনৎ পরিতোষকে বলিতেছে—আচ্ছা চলো।

মলিনার হাতের যেখানটায় সনতের স্পর্শ ঠেকিয়াছিল, সেই জায়গাটা

যেন জ্বালা করিতে লাগিল ; মলিনার মনে নরকের কৃষ্ণ সর্পের মতন এই প্রশ্নটা ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—সনৎ তাকেও ঐসবের একজন মনে করে নাকি ?

সনতের মোটর সোরগোল করিয়া উধাও হইয়া উড়িয়া চলিয়া গেল, মলিনা আবার উপরে আসিয়া রাস্তার রৌদ্র-দগ্ধ ধূলার ধ্বজার মাতামাতির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বাহিরের মতন তার অন্তরেও অপমানের জ্বালা ও সন্দেহের ধূলা পরস্পরকে পরাজয় করিবার সঙ্কল্পে রণে মাতিয়া উঠিতেছিল।

(১৯)

চিৎপুর ও হ্যারিসন রোডের চৌমাথার কাছে মোটর পৌঁছিলে পরিতোষ সনৎকে বলিল—এইবার ডাইনে যেতে হবে।

সনৎ মোটর-চালককে বলিল—গাড়ী থামাও।

গাড়ী থামিল। সনৎ মোটরের দরজা খুলিয়া দিয়া পরিতোষকে বলিল—নামো। এ গাড়ীতে আর যাওয়া চল্‌বে না।

পরিতোষ নামিয়া পড়িল। অমনি সনৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শফারকে বলিল—চালাও।

মোটর নিমেষে হাবড়ার পুলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

পরিতোষ হতভম্ব হইয়া পলায়মান মোটরের দিকে তাকাইয়া পথের ধারেই দাঁড়াইয়া রহিল। সনৎ যখন গাড়ী হইতে নামিতে বলে তখন সে ভাবিয়াছিল সনৎ বাড়ীর গাড়ীতে ঐ পাড়ায় যাইতে চায় না, সনৎও নামিয়া অন্য গাড়ী ভাড়া করিয়া যাইবে বোধ হয় ; কিন্তু এখন সনতের সয়তানি দেখিয়া পরিতোষ নিজের বোকামিতে সনতের চেয়ে নিজের উপরই বেশী চটিয়া গেল। সে হনহন করিয়া যেদিক হইতে আসিয়া-

ছিল সেই দিকেই চলিতে লাগিল, ডালিম বা আঙুরের জন্য যে তার কিছুমাত্র চিন্তা আছে তা বোঝা গেল না।

মলিনা তখনো সনতের ঘরে বারান্দার ধারে কপাট ধরিয়া মধ্যাহ্নের রৌদ্র-দগ্ধ রাস্তার দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কার পায়ের শব্দে ফিরিয়াই দেখিল পরিতোষ! মলিনার ব্যথিত ও চিন্তিত চিত্ত এই অপ্রিয়দর্শন লোকের অকস্মাৎ আবির্ভাবে চম্‌কাইয়া উঠিল, তার মুখ আরো মলিন বিবর্ণ হইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় ঠিক করিয়া দিয়া সরিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল, সুযোগ পাইলেই সে পলাইবে।

পরিতোষ হাসিতে মুখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—তুমি একলা আছ মলিন তাই ত ছুটোছুটি এলুম। সংসারে তুমিও একলা, আমিও একলা—ডাক্তারের খাসা খাসা মক্কেল আছে, সৌখীন রোগের রোগী আছে, চমৎকার সুন্দর বৌ আছে—আমাদের কেউ নেই; তাই ত তোমার কাছে এলুম—তোমার সঙ্গী আমি, আর আমার সঙ্গী তুমি হয়ে দু-দণ্ড কাটিয়ে যাব। তোমার মনটা দেখ্‌ছি ভালো নেই মলিন!

পরিতোষ মলিনার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল। মলিনা হঠাৎ পাশ কাটাইয়া তর-তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে গিয়াই ডাকিল—রাঘব।

পরিতোষ ঠোঁটের উপর দাঁত রাখিয়া বলিল—ড্যাম্‌!

মলিনার মনের মধ্যেটা হু-হু করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছিল। পরিতোষের মুখে "মলিন" বলিয়া সম্বোধন তার অত্যন্ত খারাপ অনধিকার অশোভন বোধ হইতেছিল, অথচ এই সম্বোধনটি আর-একজনের মুখে শুনিয়া তার প্রাণ পুলকিত হইয়া ওঠে, চাওয়ার বেশী পাওয়ার আনন্দে মন যে কানায় কানায় ভরিয়া ওঠে! কিন্তু "ডাক্তারের খাসা খাসা

মক্কেল আছে, সৌখীন রোগের রোগী আছে, চমৎকার সুন্দরী বৌ আছে, আর তার কেই নেই, সংসারে সে একলা—একলা!” এই যে সনতের জন্য তার মন পুড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তাকে ত সে কাছে ধরিয়া রাখিতে পারিল না! ভাবিতে ভাবিতে মলিনার মনের অন্তরালে একটা ঈর্ষার জ্বালা সঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তখনি সে নিজের মনের অবস্থায় নিজেই লজ্জিত হইয়া মনকে তিরস্কার করিয়া বলিল—‘ছি!’ এর বেশী কোনো কথা স্পষ্ট করিয়া সে নিজের মনের কাছেও বলিতে পারিল না।

রাঘব আসিয়া বলিল—কি দিদি-ঠাক্‌রুণ!

মলিনা বলিল—এসো ত ভাঁড়ার-ঘরটা গুছিয়ে ফেলি।

পরিতোষ তাহা শুনিয়া আর-একবার দাঁতে চিবাইয়া গালি পাড়িয়া বাড়ী ছাড়িয়া প্রস্থান করিল।

(২০)

সনৎ বাড়ীতে গিয়া যখন পৌছিল তখন অত বেলায় সুবাসিনী দুবেলার খাওয়া একেবারে সারিতে বসিয়াছে। বহুকাল পরে তার অতিপরিচিত মোটরের ভেঁপুর আওয়াজ তার কানে গেল; সে উচ্চকিত হইয়া খাওয়া ফেলিয়া হাতে মুখে জল ঢালিয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়া আসিল। এ যে অকস্মাৎ হইলেও প্রতিমুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা-করা পরম সৌভাগ্যের মধুর আহ্বান! সুবাসিনী আজ অন্তর দিয়া বুঝিল বৃন্দাবনে শ্যামের বাঁশী শুনিয়া গোপীরা কেন সব ফেলিয়া ছুটিত। সুবাসিনী ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে আসিতে বাঁকের মুখে থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল—ওমা! এ কি! এ কী চেহারা হয়েছে!

সনৎ তখন আধ সিঁড়ি উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। সে হাসিয়া বলিল—তোমার চেহারাও যে খুব ভালো আছে তা ত মনে হচ্ছে না।

সুবাসিনী আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—অসুখ করেছিল নাকি ?

সনৎ পত্নীকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া তারই উপর দুর্ব্বল শরীরের ভর রাখিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল—হ্যাঁ।

সুবাসিনী ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—বেশ্ লোক ত তুমি। আমি এখানে ছটফট কোরে মর্‌ছি, আর আমায় ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দাওনি।

সনৎ হাসিয়া বলিল—তুমি ব্যস্ত হয়ে ভাব্‌বে বোলেই খবর দিইনি!

স্বামীর এতদিনের অবহেলার গ্লানি স্বামীর মুখে মমতার একটি কথাতে একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গেল। সুবাসিনী স্নেহলাভের তৃপ্তির স্বরে বলিল—আমি ভাব্‌ব বোলে খবর দাওনি! ভালো হয়েও ত খবর দিতে হয় ?

সনৎ খাটের উপর বসিয়া বলিল—আজ সবে পথ্য করেছি।

সুবাসিনীর মন আনন্দে ভরিয়া গেল—তার স্বামী সবে আজ পথ্য করিয়াই তাকে দেখিতে ও দেখা দিতে ছুটিয়া আসিয়াছে! সে স্বামীর রুক্ষ চুলের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তবে আজকে তুমি এলে কেন ? আমায় বোলে পাঠালেই ত হত।

সনৎ স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—এটা কি ঠিক সত্যি কথা বলা হল সুবাস ? আমি এসেছি বোলেই এমন কথা সহজে বল্‌তে পার্‌ছ। নয় কি ?

সুবাসিনী সনতের মাথার উপর নিজের গাল কাত করিয়া রাখিয়া হাসিয়া বলিল—আমি যেতাম। তোমার এই কাহিল শরীরে······

সনৎ সুবাসিনীকে সাম্‌নে টানিয়া আনিয়া বলিল—তোমার শরীরটিও ত বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখাচ্ছে না।

সুবাসিনী অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—যে ভাবিয়েছ তুমি! তুমি কি মনে করো যে খবর না দিলে মানুষ টের পায় না? মন সব টের পায়।

বাড়ীর দাসী আসিয়া ঘরের বাহির হইতে ডাকিল—মা, খাওয়া ফেলে চোলে এলে......

সুবাসিনী তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়া বলিল—আঃ কুমো! তোর কি কিচ্ছু আক্কেল নেই! ওগুলো তুই নিয়ে খেয়ে ফেল্‌গে যা। আর পাঁচুকে বল্, চট কোরে বেদানা কিসমিস পানফল আক আপেল এইসব নিয়ে আস্‌বে। আর তুই দুধের কড়াটা আগুনে বসিয়ে দিয়ে খেতে বসিস্।

কুমো ঝি সনৎ শুনিতে পায় এমন স্বরে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল—মাসেক কাল না খাওয়া, না ঘুমোনো! এতে কি শরীর টেকে! দেহ যে শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেল!—পেটে যেটা এসেছে তার দিকেও ত চাইতে হয় ....

সনৎ চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক ভরিয়া হাসিল। সুবাসিনী লজ্জিত হাসিতে কৃশ পাণ্ডু মুখখানিকে সুন্দরতর করিয়া বলিল—মাগী যেন সং।

সনৎ সুবাসিনীর দুই হাত দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—অত সব কিছু আন্‌তে দিও না। আমি আজকেই ফির্‌ব।

সুবাসিনী সুন্দর মাথাটি জোরে নাড়িয়া এ-কাঁধ হইতে ও-কাঁধে ঠেকাইয়া বলিল—আজ আমি কিছুতেই যেতে দেবো না। এত দিন পরে এসেই যাবার জন্যে অত ব্যস্ত কেন?

সনৎ লজ্জিত হইয়া বলিল—চাক্‌রী, রোগী, কাউকেই ত এতদিন দেখা হয়নি।

সুবাসিনী চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিল—আর আমাকেই বড়

দেখেছিলে! তোমার নিজের শরীরটা আগে, না চাকরী রোগী আগে! তুমি কেন আগে খবর দাওনি আমাকে? আমি কিছুতেই ত তোমায় এখন কিছুদিন ছেড়ে দেবো না।

সনতের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট বিমর্ষ হইয়া উঠিল। সে যে মলিনাকে বলিয়া আসিয়াছে আজই ফিরিবে। সে না ফেরা পর্য্যন্ত মলিনা একলাটি যে পথ চাহিয়া ব্যাকুল হইয়া থাকিবে! কিন্তু অব্যাহতি পাইবারও ত সম্ভাবনা নাই।

সুবাসিনী স্বামীর বিষণ্ণ-চিন্তিত মুখ দেখিয়া বলিল—তোমার অসুবিধে হয় ত থেকে কাজ নেই।

পত্নীর এই কথা যেন সনৎকে আঘাত করিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমি মোটরটাকে যেতে বোলে আসি।

সুবাসিনী খুসী হইয়া বলিল—পাঁচুকে দিয়ে আমি বোলে পাঠাচ্ছি।

সনৎ বিব্রত হইয়া বলিল—খানদুই চিঠি লিখে শফারের হাতে পাঠাতে হবে।

সুবাসিনী বলিল—এখানেই কাগজ কলম এনে দিচ্ছি।

—না, আমি নীচে গিয়েই লিখে শফারকে বুঝিয়ে বোলে দিগে।—বলিতে বলিতে সনৎ নীচে নামিয়া গেল।

সুবাসিনী ছুটিয়া এই অবকাশে সনতের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে গেল।

(২১)

বাসার সাম্‌নে সনতের মোটরের ভেঁপু বাজিয়া উঠিতেই মলিনা ছুটিয়া বাহির হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ক্ষণেক পরে আসিল সনতের বদলে একখানা চিঠি হাতে করিয়া রাঘব। রাঘবকে দেখিয়াই মলিনা উৎসুক আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—বাবু এলেন রাঘব?

রাঘব বলিল—না দিদিঠাকরুন, বাবু আসবেন না।......

মলিনার মুখ কালো হইয়া উঠিল। তারপর যখন রাঘব বলিল—'বাবু তোমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন।'—তখন মলিনার মুখ সুখে ও লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মলিনা কম্পিত হাতে চিঠিখানি লইয়া ঘরে গিয়া লুকাইল। এই তার জীবনে কারো কাছ থেকে প্রথম চিঠি পাওয়া! সে অনেকক্ষণ চিঠি খুলিতেই পারিল না, দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে এই প্রথম চিঠি—তা আবার প্রিয়তমের কাছ থেকে! এই অনাস্বাদিত অতিশয় আনন্দের নূতনত্বের অনুভব তাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। দুরুদুরু বুকে থরথর হাতে মলিনা যখন খাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া প্রসারিত করিয়া ধরিল, তখন তার ভাঁজে ভাঁজে যেন নন্দনের আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল, অক্ষরপরম্পরায় যেন সুধাধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপারটা যেন তার অন্তরে বাহিরে স্বর্গ হইয়া বিরাজিত হইল। সনৎ লিখিয়াছে—

সরাব চেয়ে প্রিয়. অমৃতের চেয়েও অমিয়! তুমি প্রাণের মতন আপন, প্রাণের মতনই গোপন! যতক্ষণ কাছে থাকো বুঝ্‌তে পারি না তোমার সঙ্গে আমার কত নিগূঢ় সম্বন্ধ, দূরে গেলেই বুঝ্‌তে পারি তুমিই সব, তুমিই সব! বন্দী হয়ে বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার মন কোন্ আকাশের বিহঙ্গ, কোন সুরসরিতের মৎস্য। কবে মুক্তি পাব জানি না, কিন্তু বন্দীর মন নিরন্তর অনুক্ষণ ধ্যান কর্‌বে মুক্তির শুভ মুহূর্ত্ত।

তোমারই প্রণয়মুগ্ধ সনৎ।

একি চিঠি! এই আবেগভরা কথার মালা যে মালাবদলের মালার মতন তার বুক জুড়াইয়া, বুক জুড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিতেছে!

মলিনার মন যত সুখ অনুভব করিতেছিল, তত তার লজ্জা হইতেছিল—এর পর সে সনতের কাছে মুখ দেখাইবে কেমন করিয়া!

মলিনা আস্তে আস্তে সেইখানে বসিয়া পড়িল, আর চিঠিখানি কোলে মেলিয়া তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—বার বার পড়িয়াও তার তৃপ্তি হইতেছিল না।

অকস্মাৎ তার চমক ভাঙিল পরিতোষের আবির্ভাবে! সে তাড়াতাড়ি সনতের চিঠিখানি মুঠির মধ্যে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

পরিতোষ খুব গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল—কি বোকাই তুমি মলিন! একখানা চিঠি দিয়ে তোমায় ভুলিয়ে, সে দিব্বি ফুর্ত্তি কর্‌ছে বৌ নিয়ে—এতকাল পরে দেখা, ফুর্ত্তি হবারই ত কথা! তোমারও যেমন, আমারও তেমন, কেউ কোথাও নেই! তাইতেই ত সাধি যে তুমি আমার বাড়ীতে চলো, যেখানে সর্ব্বেশ্বরী হয়ে থাক্‌বে, কোনো সতীন কি শরিকের যেখানে বালাই নেই!

মলিনার স্বর্গরচনা মরীচিকার মতন শূন্যে মিলাইয়া গেল। সে কান্নার ঝড়ের মতন ঘর হইতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিয়া গেল—আপনার পায়ে পড়ি, আমায় ক্ষমা করুন, আমায় এমন কোরে জ্বালাবেন না।

পরিতোষের ছোট ছোট চোখ দুটা দুষ্টামিভরা হাসিতে মিটমিট করিয়া উঠিল। সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

মলিনা পলাইয়া উপরে সনতের ঘরে গিয়া খিল লাগাইয়া দিয়াছিল; এখন সে সনতের চিঠিখানি দুইহাতে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সনতের বিছানার পাশে মাটিতে হাঁটু পাতিয়া বসিয়া বিছানায় মুখ গুঁজিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কেন যে কাঁদিতেছিল, তার কারণ তার কাছে কিছুই স্পষ্ট ছিল না; সনৎ স্ত্রীর সঙ্গলাভ করিয়া

ফুর্ত্তিতে আছে বলিয়া, অথবা পরিতোষের আত্মীয়তার আঘাতে, অথবা পরিতোষের অসময়ে আবির্ভাবে তার সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া বিচূর্ণ হইয়া গেল বলিয়া তার এই কান্না, অথবা এই তিনে মিলিয়া তাকে কাঁদাইতেছিল, অথবা সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না বলিয়াই কাঁদিতেছিল।

(২২)

সুবাসিনী সনৎকে বলিল—তোমার যে শরীর হয়েছে, চলো না দিন্‌কতক কোথাও হাওয়া বদল কোরে আসি।

সনৎ এই প্রস্তাবে শঙ্কিত হইয়া বলিল—এই গরমের সময় কোথায় যাব? চারিদিকে কলেরা!

সুবাসিনী ভয় পাইয়া বলিল—তবে গিয়ে কাজ নেই কোথাও। তুমি ছুটি নিয়ে বাড়ীতেই থাকো কিছুদিন।

সনৎ এ প্রস্তাবেও আপত্তি করিয়া বলিল—চুপ কোরে থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে; তার চেয়ে আমি কাজের মধ্যে থাকি ভালো।

সুবাসিনী বলিল—তা সত্যি। সেই ত পুরী গিয়ে তুমি যা হয়ে থাক্‌তে। তা বাড়ীতে ছুটি নিয়ে না থাকো, নিত্যি তোমার বাড়ীতে আস্‌তে হবে কিন্তু।

সনৎ অগত্যা বলিল—আচ্ছা, তাই সই।

হপ্তাখানেক পরে সুবাসিনীর যখন মনে হইল, এইবার সনৎ একটু সুস্থ হইয়াছে, এখন সে কাজ করিতে পারিবে, তখন তাকে কলিকাতায় যাইবার অনুমতি দিল, কিন্তু মাথার দিব্য দিয়া অনুরোধ করিয়া দিল, সনৎ যেন রোগীদেখার খাতিরে সময়ে নাওয়া-খাওয়ার অনিয়ম না করে, এবং রোজ তিন চারটার বেশী রোগী দেখিয়া যেন অধিক পরিশ্রম না করে। সনৎ সুবোধ বালকের মতন প্রত্যেক অনুরোধ রক্ষার

অঙ্গীকার করিল—সে কোনো রকমে শীঘ্র অব্যাহতি পাইয়া যাইতে পারিলেই বাঁচে, তার মন অষ্টাহ অদর্শনে মলিনার কাছে যাইবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।

এই আটদিনে সনৎ মলিনাকে আটখানা চিঠি লিখিয়াছে; মলিনার প্রতি কিন্তু নিষেধ ছিল—সে যেন উত্তর না ছায়। এই আটখানি চিঠি যেন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর চরণশতদলের আটখানি পাপ্‌ড়ি বৈকুণ্ঠ হইতে মলিনার অঞ্জলিতে খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, দেবতার চরণের নির্ম্মাল্যের মতনই আশীর্ব্বাদে ভরা চরম মাঙ্গল্য পরম কল্যাণকর। মলিনার মা কালীঘাটে গিয়া মলিনাকে একটি সুন্দর কড়ি-বসানো বাক্‌স কিনিয়া দিয়াছিলেন; সেটি এতদিন মলিনার পরম প্রিয় শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়াই ছিল। এখন সে গোলাপী রঙের রেশমী ফিতা কিনাইয়া আনিয়া সনতের চিঠিগুলি তাতে বাঁধিয়া সেই কড়ির বাক্‌সে রাখিয়া দিয়াছে; ভক্ত পূজারীর শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের মতন সে প্রত্যহ বারবার সেই মুখস্থকরা চিঠিগুলি পড়ে।

আট দিন পরে বাড়ীর দরজায় আবার সনতের মোটরের ভেঁপু বাজিয়া উঠিল। মলিনা কম্পিত হৃদয়ে কুণ্ঠিত সঙ্কোচে ঘরের কোণে গিয়া লুকাইল। সনৎও একটা লজ্জার কুণ্ঠায় মলিনাকে ডাকিয়া দেখা করিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে মলিনা যখন জলখাবার লইয়া সনতের কাছে লজ্জায় জড়সড় হইয়া আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সনৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এতক্ষণ কোথায় ছিলে মলিন?

মলিনা লাল হইয়া মৃদুস্বরে বলিল—খুদিরা সব উঠে যাচ্ছে; খুদির মা'র কাছে ছিলাম।

সনৎ জলখাবারের রেকাবি লইয়া শুধু বলিল—ও!

মলিনা আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া আসিল। যে আবেগ ও অনুরাগের আতিশয্য সনতের প্রত্যেক পত্রের ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল, সনৎ যে বাক্যে ও ব্যবহারে তার পরিচয় দিল না, এতে মলিনা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল ; কিন্তু সে যেন একটু হতাশও হইল। মলিনা অন্তরের অনির্দ্দিষ্ট উত্তেজনায় খুদির মার সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিল। খুদির মা মনে করিল মলিনার ঐ কান্না তাদেরই বিদায়-উপহার। খুদীর মা চোখ মুছিতে মুছিতে মলিনার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মোট-বোঝাই গাড়ীতে গিয়া চড়িল।

পরদিন বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগিল। নূতন জান্‌লা ফুটানো, পলস্তারা. চুনকাম, মেঝমো, রং, দেয়ালে চিত্র হইতে লাগিল। মলিনার মুখ শুকাইয়া গেল, এই আয়োজনের দূত পাঠাইয়া কোন্ বিলাসী না জানি ঐ ঘরে ভাড়াটে আসিতেছে ! মিস্ত্রী ছুতার রঙী বিদায় লইল ; আসিতে লাগিল নূতন ছাপর-খাট, আয়না-দেওয়া দেরাজ-টানা টেবিল, আলনা, বাক্‌স, গদি-আঁটা চেয়ার, সোফা গদি বিছানা বালিশ মশারি। ইলেক্‌ট্রিক আলো, ইলেক্‌ট্রিক পাখা। সব দামি, সব সুন্দর! মলিনা অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। আরো অবাক হইল যখন দেখিল সনৎ আসিয়া সেই ঘরে জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখিবার তদারক করিতেছে। মলিনার বুকের মধ্যে লজ্জাভয় গুরগুর দুরদুর করিয়া উঠিতেছিল—এই ঘরে কি বাবু থাক্‌বেন নাকি! তার ঘরের এত কাছে—ঠিক উপরে।

রাঘব আসিয়া ডাকিল—দিদি-ঠাক্‌রুণ, বাবু ওপরে ডাক্‌ছেন।

মলিনার পা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, সমস্ত কপালে ঘর্ম্মবিন্দু কনে-চন্দনের মতন সুন্দর হইয়া দেখা দিল, সে সঙ্কুচিত হইয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সনৎ হাসিমুখে ডাকিল—ভেতরে এস।

মলিনা আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া দাঁড়াইল।

সনৎ জিজ্ঞাসা করিল—কেমন হয়েছে মলিন?

মলিনা চকিতে একবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিল—বেশ।

সেই শব্দ কণ্ঠ ছাড়িয়া মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে দ্বিগুণ আরক্ত হইয়া উঠিল। এই বিলাস-সজ্জা কার জন্য? সনৎ তার স্ত্রীকে এই বাসায় আনিয়া রাখিবে কি? মলিনার ঘরের ঠিক মাথার উপর হইবে তার প্রতিষ্ঠা এবং মলিনা হইবে তার পরিচারিকা! অথবা এই সুন্দর ঐশ্বর্য্যের জাল বিস্তার করা হইতেছে দরিদ্রা তাকেই ধরিবার জন্য!

রাঘব বলিল—এই বেশ হয়েছে বাবু। বাইরের ঘরটা বৈঠকখানা হবে।

সনৎ হাসিয়া বলিল—বাইরের ঘরটা বৈঠকখানা হবে ত আমি থাক্‌ব কোথায় রে? এ ঘরে তোর দিদি-ঠাক্‌রুণ থাক্‌বেন। তুই দেশ থেকে তোর বুড়ীকে আর মেয়েকে নিয়ে আয়, তোরা এই নীচের ঘরে থাক্‌বি, তোর দিদিমণিকে আগ্‌লাবি। তোর দিদিমণিকে এক্‌লা থাক্‌তে হয়, সে ত ঠিক নয়।

সনৎ ঘুরাইয়া বলিলেও তার কথায় সাবধানতার পরিচয় মলিনা ও রাঘব উভয়েই পাইল। রাঘব প্রভুর শুচিতার সাবধানতায় প্রীত হইয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িতে লাগিল। আর মলিনার ইচ্ছা করিতে লাগিল সনতের গায়ের উপর নিজের মাথাকে সে লুটাইলা দিয়া হৃদয়ের উদ্বেলিত কৃতজ্ঞতা ও সন্তোষ জানাইয়া দ্যায়। সনৎ যে তাকে কত ভালোবাসে তার পরিচয় ত বারে বারে প্রচুর করিয়া সে পাইয়াছে; কিন্তু সে প্রণয় যে লোলুপ নয়; প্রিয় সামগ্রীকে আত্মসাৎ করিবার জন্য লুব্ধ নয়, ইহাতেই

সেই প্রণয়ের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অধিকতর প্রকাশ পাইতেছিল, এবং সেইজন্যই না চাহিয়াও সনৎ মলিনার মন প্রাণ প্রণয়কে প্রবল আকর্ষণে নিজের অভিমুখে টানিয়া আসিতেছিল। যে অনুরাগ সনৎকে মলিনার সঙ্গে সঙ্গে তারকেশ্বর টানিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাই আবার তাকে সমস্ত রাত্রি মলিনার ঘরের বাহিরে বসিয়া ভিজিবার প্রবৃত্তিও দিয়াছিল; যে প্রণয়াবেগ তাকে দিয়া আট দিনে আটখানি প্রলাপমুখর পত্র লিখাইয়াছিল, সেই ভালোবাসাই তার মুখকে নির্বাক করিয়া মলিনাকে লজ্জা হইতে অব্যাহতি দিয়াছে; যে মমতা মলিনার বাসের ও স্বচ্ছন্দতার জন্য এত আয়োজন করিয়াছে, সেই মমতাই আবার সাবধানে তাকে দূরে রাখিয়া বৃদ্ধ রাঘবের পরিবার আনিয়া পাহারায় নিয়োজিত করিতে চাহিতেছে। সনৎ মলিনাকে এইরূপে নিকটে অথচ আড়ালে রাখিবার চেষ্টায় মলিনাকে ভালো করিয়াই জানাইয়া দিতেছিল মলিনার প্রতি তার কতখানি টান, এবং সেই টান অত্যধিক বলিয়াই তার এতখানি সাবধানতা।

মলিনা দাঁড়াইয়া থাকিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তার জন্য এই ঐশ্বর্য্যের আয়োজন তাকে দারুণ লজ্জা দিতেছিল; সে কোন্ অধিকারে এইসব ভোগ করিবে; এর পরিবর্ত্তে সনৎকে সে কি দিতে পারিবে? সব—সব—সব—অদেয় তার কিছুই নাই।

(২৩)

সনৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলে কেউ কোথাও নাই দেখিয়া মলিনা আস্তে আস্তে নিজের নূতন-সাজানো ঘরে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের চারিদিকে আনন্দ সৌন্দর্য্য শৃঙ্খলা যেন মূর্ত্তি ধরিয়া হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা করিতেছে, তারা যেন সনতের ভালোবাসা—রূপ ধরিয়া তাকেই তুষ্ট করিয়া তার মমতার প্রসাদ পাইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

এর আগে আর-একবার যখন সে সনতের আহ্বানে ঘরে আসিয়া চোখ বুলাইয়া এই ঘরের শ্রী দেখিয়া গিয়াছিল, তখন মোটের উপর ঘরের সজ্জা মাত্র দেখিয়াছিল, বিশেষ করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া কোনো কিছু লক্ষ করিবার অবসর তার হয় নাই। এখন প্রত্যেক সামগ্রীকে ছুঁইয়া দেখিয়া, টেবিলের দেরাজ টানিয়া, আয়নায় মুখের ছায়া দেখিয়া লজ্জায় সুখে হাসিয়া সে সকল দ্রব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতেছিল। আয়নার দেরাজের টানা টানিতেই মলিনা তার সঙ্গে দেখিল চিরুণী ফিতে কার্ কাঁটা—চুল বাঁধিবার উপকরণ; ক্রীম পাউডার নখরঞ্জণী এসেন্স গন্ধ, প্রসাধনের সরঞ্জাম—এসব মলিনা এর আগে কখনো চোখেও দেখে নাই, এগুলি লইয়া যে কি করিতে হয়, এর ব্যবহার সে জানেও না। বিস্ময়ে কৌতুকে তার দৃষ্টি উজ্জ্বল, মুখশ্রী সদ্যবিকাশিত ফুলের মতন সরস সুন্দর হইয়া উঠিতেছিল। দেরাজের স্তরে স্তরে কতরকমের শেমিজ পেটিকোট ব্লাউজ; কত রকমের শুজ্নি, ঝালর দেওয়া বিছানার চাদর, ফুলকাটা বালিসের ওয়াড়, তোয়ালে ঝাড়ন রুমাল। দেখিয়া দেখিয়া মলিনার কেবল মনে হইতে লাগিল—এ সব আমার! অবশেষে তার দৃষ্টি পড়িল একটি ছোট বইভরা আল্মারির উপরে। মলিনা আল্মারির দুটি কপাট খুলিয়া তার সাম্নে বসিয়া চক্চকে বইগুলি একে একে পাড়িয়া পাড়িয়া কোলের উপর মেলিয়া ধরিতে লাগিল। আল্মারির দুপাল্লা কপাট যেন সনতের বিস্তারিত বাহুর মতন তাকে আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া অন্তরের রঙিন রসমধুর বাক্যধারা মলিনার মনের কানে কানে ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে! মলিনা আনন্দের আবেশে তন্ময় হইয়া বইগুলি একটার পর একটা দেখিতে লাগিল।

তার এই সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া দিয়া তথায় উপস্থিত হইল পরিতোষ।

তার সাড়া পাইয়াই মলিনা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, আর তার কোল হইতে অনেকগুলি বই ধপ ধপ করিয়া মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল।

পরিতোষ তার ছোট ছোট চোখ দুটো বিদ্রূপের হাসিতে মিট-মিট করিয়া বলিল—বাঃ বৌদিদি! তোমার দিব্যি ঘর হয়েছে! আমি এসে সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি—শেষে রাঘবের কাছে শুন্‌লাম সনৎ তার সুয়ো রাণীর জন্যে নতুন মোতিমহল বানিয়েছে। বাঃ বাঃ! সাধে তুমি এই গরিবের দিকে ফিরেও তাকাও না।

পিছন হইতে রাঘব গলা-খাঁখারি দিয়া বলিল—বাবু, বাইরের ঘরে তামাক দিয়েছি।

পরিতোষ মনের মধ্যে গর্জ্জিয়া চাপা স্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ! ভালকুত্তা মাগী সর্‌ল ত এই বুড়ো রাস্কেল পিছু লাগ্‌ল।

পরিতোষ মলিনাকে ছাড়িয়া বাহির-বাড়ীতে প্রস্থান করিল।

রাঘব তার পিছনে পিছনে যাইতে যাইতে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল মলিনা ভীষণ ভয় হইতে ত্রাণ-প্রাপ্ত মাধুর্য্যের প্রতিমার মতন দাঁড়াইয়া আছে। রাঘব অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল সনৎ যে সময়টিতে বাড়ী থাকে না সেই সময়টি বাছিয়া বাছিয়াই পরিতোষ আসে ও মলিনাকে খুঁজিয়া ফিরে। পরিতোষের এই অনাহূত আত্মীয়তা মলিনার ভয় ও বিরক্তির কারণই হয়, এবং মলিনা অনেক দিন তার আক্রমণ হইতে আত্মত্রাণের জন্য রাঘবকে ডাকিয়া তার আশ্রয় লইয়াছে। যে সনৎ মলিনার আশ্রয়দাতা ভর্ত্তা, সে তাকে কত সম্মান সমীহ করিয়া সাবধান হইয়া চলে; আর এ কোথাকার কে, কেন যখন-তখন আসিয়া এমন উপদ্রব ঘটাইবে? এতদিন সে বলি-বলি করিয়াও পরিতোষকে কিছু বলিতে পারে নাই, পাছে বন্ধুর অপমান হইলে সনৎ কিছু মনে করে; হয়ত বা মলিনার মন পরিতোষের প্রতি বিরূপ নয়, সে ভুল বুঝিয়া

অনুমান করিতেছে মাত্র। মলিনার স্বাধীন আচরণে বাধা দিবার তার কিসের অধিকার? কিন্তু আজ সনৎকে মলিনার মর্য্যাদা রক্ষার সম্বন্ধে সতর্কতা প্রকাশ করিতে শুনিয়া ও চোখের সাম্‌নে মলিনার ভয়চকিত ত্রস্ত ব্যাকুল মূর্ত্তি দেখিয়া রাঘব মন স্থির করিয়া ফেলিল। পরিতোষ বাহিরে আসিয়া যখন সনতের ঘরে উঠিতে যাইতেছিল, তখন রাঘব কড়া স্বরে গম্ভীর গলায় বলিল—বাবু যখন না থাকেন তখন আপনি আস্‌বেন না বাবু!

এই অপ্রত্যাশিত সম্ভাষণে আশ্চর্য্য অবাক হইয়া পরিতোষ সিঁড়িতে এক পা তুলিয়া ফিরিয়া দেখিল রাঘব চোখ পাকাইয়া কঠিন হইয়া দাড়াইয়া আছে। পরিতোষ মনে মনে শিহরিয়া বলিল—এ সেই ডালকুত্তার ভূত!

পরিতোষের গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। সে সিঁড়ি হইতে পা নামাইয়া বাহিরের দরজার দিকে চলিল। সে বাড়ী হইতে ফুটপাথে নামিতেছে, সনতের মোটর আসিয়া থামিল। সনৎ গাড়ী হইতে নামিতেই পরিতোষের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখী। কিন্তু সনৎ তাকে কিছু না বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল; পরিতোষ বলিল—বেশ আছ বাবা! দিব্যি খাসা চেহারা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি!—

—বেশ আছ বাবা!

মলিনা তখন মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া অনুভব করিতেছিল তার হৃদয়ের রক্তস্রোতে ঝিন্‌ঝিন্‌ করিয়া বাজিতেছে পরিতোষের নূতন সম্ভাষণ—বৌদিদি, সনৎ তার সুয়োরাণীর জন্যে নতুন মহল বানিয়েছে!

(২৫)

সনৎ খাইতে বসিয়াছে; মলিনা তার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে। সনৎ

বলিল—আজকে একটু সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ো মলিন, একটু কোথাও বেড়াতে যাওয়া যাবে।

মলিনার সমস্ত মুখশ্রী উল্লাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেও সে যৌবনের স্বাভাবিক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, ধীর স্বরে বলিল—কোথায় যাবেন?

সনৎ কইমাছের কাঁটা বাছিতে বাছিতে বলিল—এই আলিপুরের চিড়িয়াখানায় হোক, কি শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে হোক।

মলিনা উৎসুক স্বরে বলিয়া উঠিল—আমি বোট্যানিক্যাল গার্ডেন কখনো দেখিনি।

সনৎ বলিল—বেশ, সেখানেই যাওয়া যাবে। বরাবর মোটরে যাবে, না ষ্টিমারে যাবে?

মলিনা উৎফুল্ল হইয়া বলিল—ষ্টিমারে যাওয়াই ভালো।

পরিতোষ সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়াই সনৎ ও মলিনার কথা শুনিতে পাইয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত শুনিয়া সে বিড়ালের মতন যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে আসিয়াই একখানা চল্‌তি ট্যাক্‌সি মোটর ডাকিয়া তাতে চড়িয়া পরিতোষ বলিল—হাড়কাটা গলি।

সওয়া একটার সময় সনৎ জেদ করিয়া মলিনাকে নূতন বেশ-ভূষায় সজ্জিত করিল। তারপর মোটরে চড়িয়া চাঁদপালের ঘাটের দিকে রওনা হইল। আজ এই জীবনে প্রথম বিলাস-সজ্জায় ভূষিত হইয়া মলিনার যেমন আনন্দ হইতেছিল তেমনি লজ্জাও করিতেছিল; তার উপর আবার সনতের পাশে বসিয়া মোটরে উড়িয়া যাওয়ার নূতনত্বের উন্মাদনা, বেগের উত্তেজনা, আবেগের আতিশয্য তার শরীরের রক্তধারায় খর স্রোত জাগাইয়া তুলিতেছিল। মোটরের এক-একবারের বক্রগতিতে

শরীর যখন অনিচ্ছাতেও সনতের গায়ের উপর টলিয়া পড়িতেছিল অথবা সনৎ তার গায়ের উপর স্পর্শের অমৃতপ্রলেপ দিয়া তার মনকে সুধারসের আবেশে পরিপ্লুত করিয়া অভিভূত করিতেছিল, তখন থাকিয়া থাকিয়া মলিনার বুকের উতলা রক্তনৃত্যের নূপুরশিঞ্জন তার শিরায় শিরায় বাজিয়া উঠিতেছিল। এমনিধারা কিছু একটা তোলাপাড়া সনতের মনেও চলিতেছিল বোধহয়, তাই সে মলিনার কোলের উপর রাখা পদ্মকলির মতন হাতখানি তুলিয়া আনিয়া নিজের কোলের উপর দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু সে কতক্ষণ? অবস্থাটা মর্ম্ম হইতে মনে অনুভব করিবার আগেই মোটর গিয়া চাঁদপাল ঘাটে পৌঁছিয়া গেল।

মলিনা সনতের হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া ঘাটের জেটিতে গিয়া দেখিল চাঁদপাল ঘাটের নাম সার্থক করিয়া ঘাটে যেন একপাল চাঁদ উদয় হইয়াছে। গুটিবারো কিশোরী ও যুবতী উগ্র রকমের উৎকট বেশ-বিন্যাস করিয়া জেটির উপর বিরাজ করিতেছে এবং তাদের চারিদিকে বহু শ্রেণীর পুরুষ যাত্রী ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া রাহুর মতন হাঁ করিয়া যেন তাদের গিলিতে চাহিতেছে।

মলিনা সেখানে উপস্থিত হইতেই পুরুষদের অন্যত্র-ব্যস্ত দৃষ্টি ঘুরিয়া আসিয়া তার উপরে পড়িল। মলিনা সঙ্কুচিত হইয়া সনতের গা ঘেঁসিয়া তার পাশে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

সনৎকে দেখিয়াই মেয়েগুলির মধ্যে যে বয়সে বড় সে একমুখ দোক্তা-রসাভিষিক্ত পান লইয়া ভারি গলায় বলিয়া উঠিল—এই যে ডাক্তার-বাবু, এত দেরী কোরে এলেন! আমরা কখন থেকে এসে বোসে রয়েছি।

কিশোরী তরুণীগুলি অকারণ কটাক্ষে সনৎকে বিদ্ধ করিয়া পাহাড়ের ঝরণার উপলবিষম উচ্ছ্বাসের মতন চঞ্চল হইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সনৎ যখন ডাক্তারী আরম্ভ

করে তখন পরিতোষের সুপারিশে সনৎ-ডাক্তারের এইরকম স্ত্রীলোকদের পাড়ায় পসার হইয়াছিল; সেই হইতে এদের সঙ্গে সনতের পরিচয়। ডাক্তার হইলেও সনৎ এদের সঙ্গে পরিচয় থাকাকে লজ্জা ও সঙ্কোচের ব্যাপার মনে করিত; এখন এতগুলি স্ত্রীলোকের মাঝখানে পড়িয়া এত লোকের সাম্‌নে, বিশেষত মলিনার সাম্‌নে, সনৎ অত্যন্ত সঙ্কুচিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল—কিছুই বলিতে পারিল না।

যে মেয়েটি সনতের সঙ্গে কথা বলিয়াছিল, সে বলিল—ওলো হেনা, তোর ডাক্তার-বাবুকে একটু বস্‌তে দেনা!

হেনা আবার অকারণে হাসির ঝলক বাজাইয়া বেঞ্চের উপর সরিয়া একটু জায়গা খালি করিয়া বলিল—বসুন ডাক্তার-বাবু!

দুজন মেয়ের মাঝখানে লাজুক মুখচোরা সনৎ বসিবার আহ্বানেই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল; সে অতি কষ্টে বলিল—থাক, আপনারা বসুন!

সনতের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতেছিল, সে মলিনার দিকে একবার ফিরিয়া দেখিতেও পারিতেছিল না।

মলিনা ত এই জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়া একেবারে আড়ষ্ট আকাট হইয়া গিয়াছিল, সে নিরাশ্রয় ভাবে দাঁড়াইয়া শুধু আপনাকে ধিক্কার দিতেছিল কেন সে নিজের রান্নাঘরের কোণ ছাড়িয়া এই জন-সমুদ্রের আবর্ত্তের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

সনৎ বসিতে আপত্তি করিতেই হেনা এক স্তবক ফুলের মতন তার হাত বাড়াইয়া ঝুঁকিয়া মলিনার হাত ধরিয়া বলিল—তবে তুমি বোসোসে ভাই।

মলিনা কিছু ভাবিবার বুঝিবার আগেই হেনা তাকে টানিয়া নিজের পাশে বসাইল। মলিনার আকণ্ঠ লাল হইয়া উঠিল।

একজন দর্শক সনৎকে দেখাইয়া বলিল—একজন কৃতী পুরুষ বটে!

আর একজন বলিল—চলো ঘোড়ার ডিম, কোম্পানীর বাগানেই নেবে পড়া যাবে, বাবুর মাইফেল দেখ্‌তে হবে।

অপরজন মলিনাকে দেখাইয়া বলিল—বাবু ওটিকে নতুন জোগাড় করেছে, দেখ্‌ছিস্‌নে ঠাট লজ্জা! এখনো break হয়নি।

দর্শকদের কথাগুলা সনতের মনে চাবুকের মতন লাগিল, কিন্তু তাকে নীরবে বিনা প্রতিবাদে তাহা সহ্য করিতেই হইল। মলিনা ত শুনিয়া লজ্জায় মরিয়া বাঁচিতে চাহিতেছিল। আবার ঠিক সেই সময়ে হেনা মলিনার কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিল—নতুন নতুন আমাদেরও ভাই বড় লজ্জা হত। তুমি বুঝি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে শুধু এই ডাক্তার-বাবুর কাছেই আছ?

এমন সময় বোটানিক্যাল গার্ডেন যাইবার ষ্টিমার আসিয়া পড়িল। সমস্ত জনতার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, সকলে চঞ্চল হইয়া ষ্টিমারের দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল, মলিনা পরম আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল; এতক্ষণ শত দৃষ্টির ভিড়ে তার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। বেড়াইতে যাইবার উৎসাহ তার আর একটুও ছিল না; সে এখন বাড়ী ফিরিয়া গিয়া আপনাকে লুকাইতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সে সনৎকে ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিতে পারে কি না তাও সে স্থির করিতে পারিতেছিল না।

সনতেরও মন বাড়ী ফিরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেও ফিরিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত ছিল অতগুলি মেয়ের বিদ্রূপহাস্যের ভয়ে এবং মলিনা কি ভাবিবে এই ভয়েও কতকটা।

হেনার সখী ডালিম সমস্ত দেহলতা দুলাইয়া সনতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—চলুন ডাক্তার-বাবু।

সনৎ শুষ্ক মুখে বলিল—"চলুন।" সনৎ মলিনাকে সঙ্গে লইবার জন্য পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই হেনা বায়ুহিল্লোলে লতার মতন সমস্ত দেহ-খানিকে দুলাইয়া হাসিয়া বলিল—"ভয় নেই ডাক্তার-বাবু, আপনার রত্ন হারায়নি, এই নিন।" হেনা মলিনার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখন মলিনার হাত লইয়া সনতের হাতের উপর তুলিয়া দিল।

সকল লোক তখন ষ্টিমারে চড়িবার আগ্রহে ঠেলাঠেলি করিতেছে বলিয়া এই ব্যাপার বেশী লোকে লক্ষ্য করিল না; তবু যারা দেখিল তারা নিষ্ঠুর হাস্যে মলিনাকে আঘাত করিতে ছাড়িল না। সনৎ অনুভব করিল মলিনার স্বিন্ন হাতখানি ভীরু পাখীর মতন অজগরের গর্জ্জন শুনিয়াই থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিবার জন্য সনৎ মলিনার হাতখানিকে মুঠির মধ্যে আগ্রহে চাপিয়া ধরিতে গেল, মলিনা আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া লইল।

জাহাজের যাত্রী অবতরণের স্রোতের মধ্য হইতে লম্বা পরিতোষের পেটেপাড়া মাথাটা উঁচু হইয়া বলিয়া উঠিল—সনৎ যে! কোথায় যাচ্ছ? বাগানে বুঝি? আমায় ভাই একবার শালিমারে যেতে হয়েছিল......

কথা বলিতে বলিতে পরিতোষ ভিড় হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া সনতের কাছে আসিয়াই বলিয়া উঠিল—তোফা! দঙ্গল নিয়ে জঙ্গলে চলেছ! বেশ আছ বাবা! বাড়ীতে একটি, বাসায় একটি—তাতেও মন ওঠে না, শাস্ত্রবচন সংশোধন কোরে এ যে দেখ্‌ছি "পথে নারী বিবর্জ্জিতা!" সাধে কি কবি বলেছেন—

'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমি বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভালো চলে।
আমরা সব সভ্য যুগের নব্য যুবা অনাচারী।
মনুর শাস্ত্র শুধ্‌রে দিয়ে নতুন শাস্ত্র কর্‌ব জারি॥'

"শান্তানুকূলপবনঃ শিবাস্তে পন্থা।"……জরুরি একটা কাজ রয়েছে, নইলে তোমার লোভনীয় সঙ্গ ছাড়্তাম না।……

পরিতোষ যেন কাজের তাগাদায় তাড়াতাড়ি চলিয়াই যাইবে এমনি ভাব করিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই এতক্ষণে যেন মলিনাকে দেখিতে পাইল এমনি ভাবে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। তারপর গম্ভীর হইয়া মলিনার কাছে ব্যথিত স্বরে গিয়া বলিল—বৌদিদিও এসেছ যে! তুমি এই সংসর্গে এলে কেন?

পরিতোষের ক্ষুণ্ণ স্বরের ক্ষুব্ধ তিরস্কারে মলিনা অসহায়ার কাতর দৃষ্টি তুলিয়া পরিতোষের মুখের দিকে চাহিতেই তার চোখে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল, যেন মনিদর্পণে মুক্তা বসানো হইল। পরিতোষ সেই মিনতিতে যেন বিপন্ন-উদ্ধারে-ব্রতী আত্মত্যাগীর আদর্শ হইয়া বলিয়া উঠিল—চুলোয় যাক আমার কাজ—শ পাঁচেক টাকা লোক্‌সান হবে, তা হোকগে, তা বোলে তোমায় ফেলে আমি যেতে পারিনে।

মলিনার চোখের জল কৃতজ্ঞতায় চোখের পাতায় টলটল করিয়া পড়ি-পড়ি হইয়া উঠিল। এত লোকের সাম্‌নে বলিয়া সে তাড়াতাড়ি তাহা গোপন করিল, কিন্তু পরিতোষ হেনা ও ডালিম প্রভৃতির দৃষ্টি হইতে এড়াইতে পারিল না; হেনা পরিতোষকে কটাক্ষ করিয়া ডালিমের কাঁধ ধরিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল, ডালিমও হাসিতে হাসিতে হেনাকে একটা মৃদু ধাক্কা দিয়া বলিল—আ মর ছুঁড়ি! শুধু শুধু হেসে মরিস্ কেন?

সনৎ ষ্টিমারে গিয়া মলিনাকে হাত ধরিয়া তুলিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। পরিতোষ বলিল—তুমি যাদের জন্যে ব্যস্ত তাদেরই তদারক করো, আমি বৌদিদিকে নিয়ে যাচ্ছি।

পরিতোষ মলিনার হাত ধরিয়া জাহাজে উঠিল। আজ মলিনা পরিতোষের হাত ধরায় কোনো আপত্তি করিতে পারিল না।

ফার্ষ্ট ক্লাশের বেঞ্চি জুড়িয়া সকলে বসিল। পরিতোষ মলিনাকে বলিল—তুমি কামরার ভেতরে চলো বৌদিদি, বাইরে এত লোকের মধ্যে তোমার থেকে কাজ নেই।

পরিতোষের এই প্রস্তাবে সনৎ সুখী হইল, মলিনা ত যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঘরের মধ্যে লুকাইতে পাইয়া তার মন পরিতোষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় যে পরিমাণ ভরিয়া উঠিল, সেই পরিমাণ রাগ হইল সনতের উপর—ঘরে বসিবার প্রস্তাব সনৎ ত করিল না! যাই পরিতোষ দয়া করিয়া আসিল নিজের অত ক্ষতি করিয়া, নহিলে ত ঐসব মুখপুড়ীদের সঙ্গেই তাকে যাইতে হইত!

বাগানে গিয়া হেনা ডালিম প্রভৃতি সকলে সনৎকে এমন করিয়া ঘিরিয়া হাসিতে গল্পে কোলাহলে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে মলিনা সনৎ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। পরিতোষ হইল তার সঙ্গী। মলিনা যে পরিতোষকে আশ্রয় পাইয়া এই কলুষিত সঙ্গ হইতে দূরে রহিতে পারিয়াছে তাতে মলিনা যেমন সুখী হইতেছিল, সনৎও তেমনি সুখী হইতেছিল। সনৎ মনে করিতেছিল, কোনো এক ফাঁকে সে মলিনাকে লইয়া পলায়ন করিতে যতক্ষণ না পারিতেছে ততক্ষণ সে পরিতোষের সঙ্গেই থাকুক, আমি কথায় বার্ত্তায় এদের ব্যাপৃত করিয়া রাখি। পরিতোষ কিন্তু ক্রমাগত সনতের আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আপন মনেই যেন বলিতে লাগিল—সনৎটা একেবারে বয়ে গেছে! ভদ্রলোকের মেয়েকে এনে এ-রকম অপমান! ছ্যাঃ!

পরিতোষ মলিনাকে বলিল—ওদের পেছনে পেছনে বেড়িয়ে বেলেল্লাপনা দেখে লাভ কি, তুমি এই পথে চলো বৌদি—ওরা ওদিকে যাচ্ছে যাক্।

মলিনা অনাবশ্যক হইয়া উপেক্ষিতার মতন সকলের পিছনে পিছনে

চলিতে ক্লেশ বোধ করিতেছিল, সে পরিতোষের প্রস্তাবে কিছুমাত্র আপত্তি না করিয়া পরিতোষের সঙ্গে ভিন্ন পথে বাঁকিয়া গেল।

পদ্মদীঘির পাড়ে গিয়া পরিতোষ বলিল—এইখানে বোসো বৌদি, তোমার মুখ বড় শুকিয়ে গেছে।

মলিনা ছিন্ন লতিকার মতন সেইখানে বসিয়া পড়িল, তার যেন নিজের ইচ্ছাশক্তি একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে।

ঘাসের উপর পাতা মলিনার হাতের উপর পরিতোষ হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল—দেখ্‌লে বৌদিদি, সনৎ তোমায় কাদের সঙ্গে সমান ভাবে? যে তোমাকে ভালোবাসে তার কাছে থাকা গৌরবের, না, যে দুশ্চরিত্র তোমাকে ঐসব লোকের সমান ভাবে তার কাছে থাকা গৌরবের? চলো বৌদি, আমার বাড়ীতে তুমি চোলে চলো, আমি তোমায় মাথায় কোরে রাখ্‌ব।

একটা ভ্রমর ঈষৎবিকশিত একটা পদ্মের পাপ্‌ড়ি সরাইয়া তার মর্ম্মকোষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, মলিনা একদৃষ্টে তাই দেখিতেছিল, পরিতোষের কথার কোনো উত্তর দিল না।

পরিতোষ মলিনার হাত নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল—চলো মলিন, আমরা চোলে যাই। সনৎ ওদের নিয়েই থাকুক। তুমি আমার, তুমি আমার.........

পরিতোষ গদ্‌গদ স্বরে কথা বলিতে বলিতে মলিনার হাত তুলিয়া ধরিয়া তার উপর চুম্বন করিল। পরিতোষ মলিনার হাতের উপর লালসালোলুপ চুম্বন করিতেই মলিনা চম্‌কিয়া উঠিল; জোর করিয়া হাত টানিয়া লইয়া ত্বরিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমাকে ডাক্তার-বাবুর কাছে নিয়ে চলুন।

পরিতোষ থিয়েটারী ঢঙে বলিয়া উঠিল—দেখ সনৎ দেখ কি পবিত্র

ভালোবাসা, কি ভালোবাসার তুমি অপমান করছ! তুমিই জগতে সুখী! আর হতভাগা আমি.........

পরিতোষ ফোঁস করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—চলো বৌদি, তুমি যেখানে সুখ পাও সেখানেই আমি তোমায় নিয়ে যাব।

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মলিনা দেখিল—বড় বটগাছতলায় সনৎকে ঘিরিয়া বসিয়া সকল মেয়েরাই কণ্ঠ মিলাইয়া গান করিতেছে—

আজ তোমারে করব মাতাল ওগো প্রাণের বঁধু
পান করিয়ে অধরপুটে টাট্‌কা প্রণয়-মধু!

এইটুকু গান শুনিয়া মলিনা হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া পরিতোষকে বলিল—আমায় আপনি বাড়ী নিয়ে চলুন।

পরিতোষ বলিল—তাই চলো মলিন, তাই চলো—তুমি বুঝ্‌তে পারছ না, তোমার অপমানে আমার কী ক্লেশ হচ্ছে!

মলিনা নীরব শুষ্ক ম্লানমুখে পরিতোষের সঙ্গে ফিরিয়া চলিল। তখনো দূর হইতে গানের রেশ তার কানে আসিয়া আঘাত করিতেছিল—

আজ তোমারে করব মাতাল ওগো প্রাণের বঁধু!

পরিতোষ তখন সাধনার সিদ্ধি ও কাম্য লাভের আনন্দে বিভোর হইয়া মলিনার সঙ্গে ক্রমাগত বকিতে বকিতে যাইতেছিল। তার সেই বাক্যের ফোয়ারায় উৎসারিত হইতেছিল সনতের কত কাল্পনিক নিন্দা ও নিজের কাল্পনিক প্রণয়ানুরাগের আতিশয্যের স্তুতি। কিন্তু মলিনার মন তখন দুঃখ-বেদনায় কানায় কানায় ভরিয়া ছিল, তার মনে পরিতোষের প্রলাপ প্রবেশের পথ আর ছিল না।

সনৎ পুরাতন ও বিত্তবতী মেয়ে-মক্কেলদের সঙ্গে পরিচয়ের ভদ্রতা রক্ষা করিতে গিয়া তাদের নিত্য অভ্যাসের ছলাকলার জালে জড়িত হইয়া পড়িলেও তার মন মলিনার জন্য ব্যাকুল ব্যস্ত হইয়া ছিল। বহুক্ষণ

মলিনাকে না দেখিতে পাইয়া সনৎ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, সে ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া তরুণীদের পরিহাসে বিব্রত বোধ করিতেছিল। অবশেষে সে আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িল। তখন হেনা কণ্ঠস্বর কোমল মধুর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ডাক্তার-বাবু কোথায় চল্‌লেন ?

সনৎ চোখমুখ লাল করিয়া বলিল—আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁকে খুঁজে দেখি।

ডালিম বলিল—সঙ্গে ত দেবর লক্ষ্মণ আছেন, পঞ্চবটী বনে সীতাহরণ হবে না।

সনৎ লজ্জিত হইয়া হাসিয়া তরুণীদের নিবিড় ব্যূহ ও এত রূপসী তরুণীর সঙ্গীত-রসালাপে আকৃষ্ট জনতা ভেদ করিয়া বাহির হইতে হইতে বলিল—তবু একবার দেখা ভালো।

ডালিম বলিয়া উঠিল—ডাক্তার-বাবুর ভয় হচ্ছে রক্ষকই পাছে ভক্ষক হয়।

তরুণীদের মধুকণ্ঠের হাস্যশিঞ্জন সেই বটকুঞ্জতলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছড়াইয়া পড়িল। সনৎ বাণাহত মৃগের ন্যায় বিরহবিধুর হৃদয়ে হারানো প্রিয়ার সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সনৎ বটচ্ছায়ার ছত্রতল হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল সম্মুখে কালো হইয়া মেঘ করিয়াছে, আকাশের জলভরা নীল চোখের ঘন পল্লবে জল যেন ছলছল করিতেছে; হয়তবা ঝড় উঠিবে মনে করিয়া সনৎ গতিবেগে উত্তরীয় উড়াইয়া বাগানের পথে পথে কুঞ্জে কুঞ্জে মলিনাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল। মলিনাকে খুঁজিয়া পাইতে যত বিলম্ব হইতে লাগিল ততই সনতের রাগ হইতে লাগিল নিজের ভদ্রতার ও স্বার্থের দুর্ব্বলতার উপর—কেন সে ঐসব বদ লোকের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষা করিতে গেল, তারা রুষ্ট হইয়া

না হয় তাকে চিকিৎসা করিতে আর নাই ডাকিত; সনতের রাগ হইতে লাগিল পরিতোষের উপর, সে মলিনাকে লইয়া কোথায় গেল; আর রাগ হইতে লাগিল মলিনারও উপর, সে তাকে ছাড়িয়া অপরের সঙ্গে একলা এতক্ষণ কেমন করিয়া যাপন করিতেছে। সনৎ দ্রুতবেগে সমস্ত বাগান খুঁজিতে খুঁজিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া, ক্রমশ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—মলিনা গেল কোথায়? সনৎ হঠাৎ ষ্টিমারের বাঁশি শুনিয়া চমকিত হইয়া ঘড়ি দেখিল—কলিকাতায় ফিরিবার ষ্টিমার আসিবার সময় হইয়াছে। তখনই তার মনে হইল মলিনারা বাগানে যখন নাই, তখন ওরা নিশ্চয় এই ষ্টিমারে কলিকাতা ফিরিতেছে। মনে হইতেই সনৎ উর্দ্ধশ্বাসে ঘাটের দিকে ছুটিল। ঘাটের কাছে গিয়া দেখিল ষ্টিমার জেটিতে লাগিয়া ফোঁস ফোঁস করিয়া অজগরের মতন নিশ্বাস ছাড়িতেছে। সনৎ প্রাণপণ বেগে দৌড়িয়া গিয়া একখানা টিকিট করিল এবং টাকা-ভাঙানি পয়সা লইবার অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিয়া জেটিতে গিয়া দাঁড়াইয়া উৎসুক ব্যাকুল দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল মলিনা জাহাজে আছে কি না। জাহাজের সারেং পোঁক্ পোঁক্ করিয়া বাঁশি বাজাইয়া তাকে সচেতন করিয়া ধম্‌কাইয়া উঠিল—বাবু, উঠে পড় না, তোমার জন্যে জাহাজ কতক্ষণ দেরি কর্‌বে?

সনৎ তবুও জাহাজে না উঠিয়া ব্যাকুল দৃষ্টিতে জাহাজের এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল। ঠং টং টং করিয়া জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, খালাসিরা জাহাজের কাছি গুটাইয়া লইল। জাহাজ আস্তে আস্তে জেটি হইতে সরিয়া যাইতেছে। সনৎ দেখিতে পাইল মলিনার হাত ধরিয়া পরিতোষ জনতা ঠেলিয়া ষ্টিমারের সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতেছে। সনৎ এক লাফে জাহাজের রেলিং ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া জাহাজে গিয়া উঠিল এবং খালাসিদের তিরস্কার ভর্ৎসনা অগ্রাহ্য

করিয়া ক্ষিপ্তের মতন দুহাতে লোক ঠেলিয়া মলিনার পাশে গিয়া হাপরের মতন হাঁপাইতে লাগিল। পরিতোষ ও মলিনা একবার উদাস নেত্রে তার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া বেঞ্চিতে গিয়া বসিল, তার সঙ্গে যে তাদের পরিচয় আছে এ ভাবটুকুও প্রকাশ পাইল না। তাদের ভাবগতিক দেখিয়া সনৎও আর কিছু বলিতে পারিল না, সে অবসন্ন ভাবে একটা বেঞ্চিতে অবশ শিথিল হইয়া বসিয়া পড়িল। তখন ঝড় আর বৃষ্টি গঙ্গার বুকে মাতামাতি সুরু করিয়া দিয়াছে।

সমস্ত জলপথটা তিনজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরিতোষ মলিনাকে বলিবে বলিয়া অনেক কিছু কল্পনা মনে মনে করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সনৎ নিকটে বসিয়া থাকাতে তার সমস্ত প্ল্যান পণ্ড হইয়া গেল, সেও আর মুখ খুলিতে পারিল না।

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িলে সনৎ যেন সে তল্লাটেই নাই এবং মলিনা যেন সনতের কেউ নয় এমনি ভাবে পরিতোষ বলিল—এস মলিনা।

সনৎ অবাক কৌতূহলে পরিতোষ ও মলিনার মুখের দিকে চাহিল।

পরিতোষ সনতের সেই চাহনি অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করিতে পারিলে তার পক্ষে বোধহয় ভালো হইত, কিন্তু সে তা পারিল না; মলিনার উপর তারই সম্পূর্ণ অধিকার আজ হইতে বর্ত্তিয়াছে ইহা যেমন সে আচরণে এতক্ষণ প্রকাশ করিয়া আসিতেছিল, তেমনি করিতে থাকিলেই তার দাবী সাব্যস্ত হইয়া যাইলেও যাইতে পারিত; কিন্তু মনে মনে দোষী সে, সনতের অবাক দৃষ্টির আঘাতে থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল—ছোটলোকের সঙ্গে অপমান হতে মলিনা আর যাবে না, এখন থেকে সে আমার কাছেই থাকবে। এস মলিনা……

পরিতোষ মলিনার হাত ধরিয়া চলিবার উপক্রম করিল।

পরিতোষের সঙ্গে মলিনার চলিয়া আসাতেই সনৎ ক্ষুব্ধ বিরক্ত হইয়াছিল, এখন পরিতোষের কথায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; কিন্তু লোকের সাম্‌নে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিবার ভয়ে সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

সনৎকে নীরব নিষ্ক্রিয় দেখিয়া পরিতোষ সাহস পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠিল, সে মলিনার পিঠে হাত দিয়া বলিল—চলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভিড় কমে গেছে।

মলিনা এতক্ষণ সনতের ব্যবহারে ও পরিতোষের মায়ায় আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া ছিল, এখন পরিতোষের বাক্যে ও ব্যবহারে এবং সনতের ম্লান বিবর্ণ মুখ দেখিয়া তার চেতনা ফিরিয়া আসিয়াছিল; সে গা মুড়িয়া আপনাকে পরিতোষের বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিল এবং সরিয়া গিয়া সনতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

সনৎ একবার তার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিল। মলিনাও তার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। হতবুদ্ধি পরিতোষ বিজয়ীর রথ-চক্রে শৃঙ্খলবন্দী পরাজিত শত্রুর মতন অসহায় অপমানিত হইয়া তাদের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। সনৎ ঘাটের উপর গিয়া একখান ট্যাক্‌সি-মোটর ভাড়া করিয়া তার দরজা খুলিয়া ধরিতেই মলিনা বিনা আহ্বানেই আগে উঠিয়া বসিল, সনৎও পরিতোষের দিকে না তাকাইয়া চড়িয়া বসিল। পরিতোষের চোখে মুখে দুর্গন্ধ ধোঁয়ার ঝাপ্‌টা মারিয়া ট্যাক্‌সি রওনা হইল। সদ্য বৃষ্টির খানিকটা কাদাজল ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পরিতোষের পরিধেয়কে ছিট করিয়া দিল। পরিতোষ বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের কিল মারিয়া বলিয়া উঠিল—ধুত্তোর! এত জোগাড়-যন্তর এক মিনিটের জন্যে সব ভেস্তে গেল! ডালিম আর-

এক মিনিট যদি ধোরে রাখ্‌তে পার্‌ত তবে ত কেল্লা ফতে হয়ে গিয়েছিল আর কি !......

পরিতোষ ক্ষুব্ধ আক্রোশে ইংরেজি বাংলা গালি উচ্চারণ করিতে করিতে সেইখানে পায়চারি করিতে লাগিল—এর পরের ষ্টিমারে ডালিম-হেনারা ফিরিয়া আসিলে তাদের সঙ্গে একচোট ঝগড়া করিবে এই প্রতীক্ষায়।

(২৬)

অনেকক্ষণ বিচ্ছেদ-অবহেলা সহ্য করার পরে সনতের পাশে বসিতে পাইয়া মলিনার অপমান-আহত অভিমানের রুদ্ধ বেদনা চোখের জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, এ কান্নায় যেন মলিনার সমস্ত দেহমন গলিয়া জল হইয়া পড়িবে।

সনৎ বিরক্ত স্বরে বলিল—আবার কান্না হচ্ছে কেন? পরিতোষের সঙ্গে গেলেই ত পার্‌তে? আমি ত তোমায় ডাকিনি।

সান্ত্বনার কোমলতা যেখানে আশা করিতেছিল সেখান থেকে এই কঠোর আঘাত সত্ত্বেও মলিনা সনতের কোলের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া করুণ অনুযোগের স্বরে বলিল—আপনি ঐসব লোকের সঙ্গে আমাকে নিয়ে গিয়ে কেন অপমান কর্‌লেন? ও-রকম লোক নিয়ে আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন জান্‌লে আমি আপনার সঙ্গে কখ্‌খনো আস্‌তাম না।

মলিনা পরিতোষের সঙ্গে একলা সনৎকে না বলিয়া চলিয়া আসাতেই সনতের মন বক্র হইয়া ছিল; ডালিম হেনা প্রভৃতির আবির্ভাবের রহস্য তার কাছেই অমীমাংসিত থাকিয়া তার মনকে তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, অথচ সেই দোষে মলিনা তাকেই অপরাধী করিয়া অভিযোগ করিতেছে; মলিনা এত সহজে তাকে অবিশ্বাস করিতে পারিল; সে যে সকলকে ছাড়িয়া তাদের পিছে ফেলিয়া মলিনার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, নিজের

জীবনকে বিপন্ন করিয়া চলন্ত জাহাজে লাফাইয়া চড়িয়াছে, এসব মলিনা লক্ষ্যই করিল না ;—ইহা ভাবিয়া সনতের মনের ক্রোধ হঠাৎ ক্রূর হইয়া উঠিল। আজ প্রথম মলিনা নিজে সাধিয়া তার কোলে মাথা রাখিয়াছে, তাতেও তার মন কোমল হইল না। সনৎ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—ঐসব লোকের সঙ্গে যদি তোমায় নিয়ে গিয়েই থাকি তাতে হয়েছে কি ? যে একবার আমার আর-একবার পরিতোষের মন ভুলিয়ে বেড়াতে পারে, তার সঙ্গে ওসব লোকের তফাৎ কোথায় ?

মলিনা চরম অপমানে নিপীড়িত হইয়া তপ্ত লৌহের স্পর্শের মতন সনতের কোল হইতে চট করিয়া মুখ তুলিয়া লইল। তারপর আহত সম্মানের গর্ব্বিত স্বরে বলিল—আপনি জানেন কিনা আমি অসহায় নিরাশ্রয় তাই এই অপমান কর্‌তে পার্‌লেন।

মলিনা চোখের জল মুছিয়া শক্ত হইয়া বসিল। সনৎ সেই প্রবুদ্ধ তেজস্বিতার মহিমান্বিত মূর্ত্তি দেখিয়া অপ্রতিভ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ী আসিয়া সনতের বাসার সাম্‌নে থামিতেই মলিনা সনতের অপেক্ষা না করিয়াই গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফেলিল এবং টপ করিয়া নামিয়া হনহন করিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। সনৎ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া ট্যাক্‌সিওয়ালাকে বলিল—সাল্‌কিয়া চলো।

ট্যাক্‌সি মোড় ঘুরিয়া কাদা ছিটাইয়া ছুটিল। তখন আবার ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

মলিনা একরকম ছুটিয়া নিজের ঘরে গিয়া অঙ্গ হইতে সনতের দেওয়া বিলাস-ভূষণ খুলিয়া ফেলিতে লাগিল, যেন অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বা তার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র-অলঙ্কারের আকারে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে !

মলিনাকে ছুটিয়া যাইতে ও সনৎকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রাঘব

আস্তে আস্তে মলিনার ঘরের দরজার কাছে গিয়া গলা-খাঁকারি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবু কি আজ আস্‌বেন না দিদিমণি ?

মলিনা রুক্ষ গম্ভীর স্বরে বলিল—জানিনে।

রাঘব জিজ্ঞাসা করিল—উনুনে আগুন দেবো কি ?

মলিনা তেমনি ভারি গলায় বলিল—বাবু যদি না আসেন, দেবার দর্‌কার নেই, তুমি খাবার কিনে এনে খেয়ো।

রাঘব চলিয়া আসিতেছিল ; মলিনা ডাকিয়া বলিল—রাঘব, আমার মা মাসী বোন যে ঘরে মরেছে সেই ঘরটা আমায় ছেড়ে দিয়ো, আমি সেই ঘরে থাক্‌ব।

রাঘব মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া আসিতে আসিতে ঠোঁট উল্টাইয়া দুই হাত ঘুরাইয়া আপন মনেই বলিল—বুবো বয়েসের আগা-গোড়াই অনাছিষ্টি !

আজ সনতের অপমানের আঘাতে মলিনার সকল আশ্রয় যেন বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে সান্ত্বনার জন্য মরা মা মাসী বোনকে স্মরণ করিতেই কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল, সে আর্ত্ত স্বরে মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে মেঝের উপর লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তখন বাহিরে সাইক্লোনের ঝোড়ো বাতাসও একটা মা-হারা দুর্দ্দান্ত দৈত্য-শিশুর মতন হাত পা আছ্‌ড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছিল।

(২৭)

সনৎ মলিনাকে অন্যায় আঘাত করিয়া, মলিনার দৃপ্ত সম্মান-গর্ব্ব দেখিয়া ও নিজের হঠকারী আচরণে লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু মলিনা মনে করিল তার অন্যায় ঔদ্ধত্যকে দণ্ড দিয়াই সনৎ তাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

সনৎ মলিনার ভয়ে দিন সাত আট আর কলিকাতার বাসায় আসিলই না, সাল্‌কিয়ার বাড়ী হইতেই হাস্‌পাতালে যাতায়াত করিতে লাগিল, জলখাবার পর্য্যন্ত বাড়ী হইতে লইয়া আসিত।

অনেককাল পরে স্বামীকে কাছে পাইয়া সুবাসিনী উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সে নানাবিধ আয়োজনে স্বামীর সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সনতের মনের মধ্যে যে একটা অশান্ত উদ্বেগ জমিয়াছিল, তাহা সে নিজের আনন্দে লক্ষ্য করিতে পারিতেছিল না।

এদিকে পরিতোষ মলিনাকে আয়ত্ত করিবার এমন ষড়যন্ত্রও বিফল হইয়া গেল দেখিয়া স্থির বুঝিল যে মলিনাকে ভুলাইয়া নিজের প্রতি অনুরাগী করিয়া সনতের আশ্রয় হইতে নিজের আয়ত্তে লইয়া আসা সহজ নয়। যে কাণ্ড হইয়া গেল ইহার মূল কে তাহা সনৎ ও মলিনা দুইজনেই টের পাইয়াছে মনে করিয়া পরিতোষ সনতের বাড়ীর দিকেও আর ভয়ে ঘেঁষিতে পারিতেছিল না। এখন সে ভাবিতে লাগিল যদি কোনোমতে মলিনাকে সনতের আশ্রয়চ্যুত করিয়া দিতে পারি, তবে নিরাশ্রয় হইয়া মলিনা তার আশ্রয় আনন্দেই গ্রহণ করিবে। এই উদ্দেশ্যে তার দুষ্টবুদ্ধিকে উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত করিয়া পরিতোষ দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

একদিন সুবাসিনী একখানা চিঠি পাইল, অচেনা হাতের লেখা। তাতে লেখা আছে—

"ভদ্রে,

আপনার স্বামী কলিকাতার বাসায় একটি সুন্দরী যুবতীকে লইয়া বাস করেন। আপনি এর প্রতিবিধান করিবেন।

আপনাদের হিতৈষী বন্ধু।"

চিঠি পড়িয়া সুবাসিনীর মুখ মুহূর্ত্তের জন্য কালো হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে হাসিয়া চিঠিখানা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পিকদানীতে ফেলিয়া দিল।

সনৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিলে সুবাসিনী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি কারো সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?

সনৎ চম্‌কিয়া উঠিল, শঙ্কিত মুখে উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল—না, অম্‌নি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম।.........মানুষের পসার প্রতিপত্তি যত বাড়ে তত শত্রুও বাড়ে। না?

সনৎ প্রশ্নের অর্থ না বুঝিয়া শঙ্কিত মনে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া জামা ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—পৃথিবীতে পরশ্রীকাতর লোকের সংখ্যা ত কম নয়।

সুবাসিনী সনতের হাত হইতে জামাটা লইয়া উৎফুল্ল হাস্যে সনতের মনের সকল সঙ্কোচ উড়াইয়া দিয়া বলিল—তাই!

এই সহজ হাসিতে সনৎ আশ্বস্ত হইলেও সুবাসিনীর কথার ধাঁধা তার কাছে পরিষ্কার হইল না। সনতের মনের ভিতরটায় একটু ধুক্‌পুকুনি রহিয়াই গেল।

পরদিন সনৎ কলিকাতায় আসিয়া নিজের বাসায় গেল। সে চোরের মতন ভয়ে ভয়ে নিজের ঘরে গিয়া রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিল—তোর দিদিমণি কোথায় রে?

রাঘব বলিল—সেদিন বেড়িয়ে এসে তক্ দিদিমণির কি হয়েছে, আমাকে নীচের ঘর থেকে বের কোরে দিয়ে সেই ঘরের মাটিতে পোড়ে কেবল কাঁদে। ডেকে দেবো?

সনৎ বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল—না।

রাঘব আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল।

তখনি সনৎ বিছানায় উঠিয়া বসিয়া দেখিল—প্রতিদিনের মতন আজও তার টেবিলের উপর ফুলদানীতে টাট্‌কা ফুল সাজানো রহিয়াছে; সেদিনকার খবরের কাগজখানি ভাঁজ করিয়া চাপা দেওয়া আছে; সে প্রত্যহ আহারের পর ডাব খায়, একটি ডাব জলের বাল্‌তিতে ভিজিতেছে। এ কোন্ পূজারিণীর প্রতীক্ষা এই আট দিনের অদর্শনকে অতিক্রম করিয়া এমন সুন্দর সরস সজীব হইয়া আছে তাহা বুঝিতে সনতের বিলম্ব হইল না। সে উঠিয়া খালি পায়েই সন্তর্পণে মলিনার সন্ধানে চলিল।

মলিনা তখন সদ্য স্নান করিয়া মেঝের উপর দীর্ঘ কুঞ্চিত চুলের ঢেউ খেলাইয়া শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল সনৎকেই—আজ নয়দিন তিনি আসিলেন না, আর কি তিনি আসিবেন না? তিনি যদি তাকে ত্যাগ করিতেই চান, তবে ত তার এখানে গলগ্রহ হইয়া পড়িয়া থাকা ঠিক হইবে না। কিন্তু যাইবেই বা সে কোথায় এবং যাইবার আগে একবার কি ক্ষমা চাহিয়া জানাইয়া যাইবারও অবসর মিলিবে না যে—ওগো আমি তোমারই, আর কাকেও ভালোবাসি নাই, ভালো বাসিব না! .....

ভাবিতে ভাবিতে মলিনার চোখ জলে ভাসিতেছিল।

সনৎ ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মলিনা পিছন ফিরিয়া শুইয়া আছে। সে আস্তে আস্তে ঘরে গিয়া তার পিঠের কাছে দাঁড়াইল।

মলিনা ঘরে লোক আসার পায়ের শব্দ শুনিয়া মনে করিল, রাঘব বোধ হয় প্রত্যহের মতন রান্না-খাওয়ার অনুরোধ লইয়া জ্বালাতন করিতে আসিয়াছে। মলিনা উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া যেমন ছিল তেমনি চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

সনৎ মনে করিল মলিনা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে ঝুঁকিয়া তার স্নানশীতল ললাটে হাত রাখিয়া ডাকিল—মলিন!

এতদিন পরে সেই কোমল স্পর্শ আর সেই স্নেহার্দ্র আহ্বান হতাশ মলিনাকে একেবারে আত্মবিস্মৃত সুখোন্মত্ত করিয়া তুলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই হাতে সনতের দুই পা জড়াইয়া তার উপর মাথা রাখিয়া কান্না-গলা মিনতির স্বরে বলিল—আমায় ক্ষমা করুন, আমায় ক্ষমা করুন।

সনৎ সেই মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মলিনাকে তুলিয়া ধরিয়া গাঢ় স্বরে বলিল—তুমিও আমায় ক্ষমা করো মলিন। আমায় বিশ্বাস করো, আমি তোমায় ভালো বাসি, শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। সেদিনকার ঘটনা হয় ত অকস্মাৎ, নয়ত পরিতোষের কারসাজি—তারা যাবে জান্‌লে আমি তোমায় কখনো নিয়ে যেতাম না। আমরা দুজনেই ভুল কোরে তার দণ্ড শাস্তি ভোগ করেছি—তার জের আর টেনে কাজ নেই।

আজ এই অকস্মাৎ হারাইয়া পাওয়ার আনন্দে সনৎ ও মলিনা এমন আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল যে সনৎ দুই হাতে মলিনার দুই বাহু ধরিয়া কথা বলিতেছিল এবং মলিনাও নিঃশেষে আপনাকে সমর্পণ করিয়া অবাধে সেই আদর সহ্য করিতেছিল। বাহিরে রাঘবের গলা-খাঁখারির শব্দ শুনিয়া উভয়ের চেতনা ফিরিয়া আসিল। সনৎ লজ্জিত হইয়া মলিনাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। মলিনাও লজ্জায় সিঁদুরঢালা মুখে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া বলিল—রাঘব, উনুনে আগুন দাওগে, বাবুর এখনো খাওয়া হয়নি।

তখন পাশের কোন্ বাড়ী হইতে পিঁজ্‌রায় বন্দী পাপিয়া পাখীর ডাক শোনা যাইতেছিল—চোখ গেল! চোখ গেল!

(২৮)

পরিতোষ সুবাসিনীকে বেনামী চিঠি দিয়া তার ফল দেখিবার জন্য সনতের বাসার কাছে কাছে ঘুর-ঘুর করিয়া বেড়ায়। সে দেখিল সনৎ আবার আগেরই মতন বাসায় আসা-যাওয়া করিতেছে, কলহ কোলাহল তিরস্কার কান্না কিছুরই সোর-গোল বাহির হইতে শোনা যায় না। তখন সে মলিনাকে এই চিঠি লিখিল—

"প্রিয়তমাসু,

যদি কোনো বিপদ বা অসুবিধা ঘটে স্মরণ রেখো তোমার প্রণয়মুগ্ধ বন্ধু আছে—

হতভাগা পরিতোষ।"

মলিনা তখন রান্না করিতেছিল, রাঘব চিঠিখানা লইয়া গিয়া মলিনাকে দিল। মলিনা চিঠি পড়িয়া আগুনের মতন উত্তপ্ত ও লাল হইয়া চিঠিখানা আগুনে ফেলিয়া দিল এবং রাঘবকে কঠোর স্বরে বলিল—ত্যাখ্ রাঘব, পরিতোষ-বাবু যদি এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসে তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে দূর করে দিবি!

রাঘব বুঝিল চিঠিখানা অন্যায় অসহ্য কথা বহন করিয়া আনিয়াছে এবং সেই চিঠির বাহন হওয়া তারও উচিত হয় নাই; সে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

পরিতোষ রাঘবের মুখে মলিনার উত্তর শুনিয়া অপমানে ও নিষ্ফলতায় উগ্র হইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

সেই দিন সুবাসিনী পরিতোষের একখানা চিঠি পাইল—

"ভদ্রে,

আপনি আমার নাম নিশ্চয় জানেন, যেহেতু আমি সনতের সতীর্থ সুহৃৎ। তা ছাড়া পরিতোষ ঘোষালের নাম বাংলা দেশে কে না জানে, আমি দুর্মুখ কাগজের সম্পাদক। সনতের দুর্মতি ও অধঃপতন

দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছি দুই কারণে—প্রথম, বন্ধু বলিয়া বন্ধুর অবনতিতে দুঃখিত; দ্বিতীয়তঃ, সাধারণের সেবক সংবাদপত্রের সম্পাদক আমি, দুশ্চরিত্র ডাক্তার সমাজে ছদ্মবেশে লোক ভুলাইয়া ভদ্রলোকের শুদ্ধান্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া দুঃখিত। আমি মনে করিয়াছিলাম আত্মগোপন করিয়া বন্ধুর হিতসাধন করিব, তাই বেনামী চিঠিতে আপনাকে সতর্ক করিয়াছিলাম। কিন্তু চিঠি বেনামী বলিয়া আপনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই দেখিতেছি। এক্ষণে স্বনামে আপনাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইতেছি।

সনতের বাসায় রাঁধুনি নামে পরিচিত যে মেয়েটি আছে তার বয়স বছর আঠারো, অপরূপ সুন্দরী, যদিও নাম তার মলিনা। সনৎ তাকে সিল্কের জামা ও কাপড় এবং সোনা-জহরতের গহনা দিয়া সাজাইয়াছে, তার থাকিবার ঘর রাণীর আস্‌বাবে ভরিয়াছে। একি কেবল পাচিকার পাক-প্রণালীর পুরস্কার?

বন্ধু হইয়া বন্ধুকে যতদূর বুঝাইবার বুঝাইয়াছি। সনতের চেতনা রূপের কুহকে আচ্ছন্ন, সে বন্ধুর হিতকথা কানে তোলে না। তাই আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, আপনি আপনার স্বামীকে রক্ষা করুন, দেশের মাতৃস্বরূপিণী সাক্ষাৎ দেবী নারীদিগকে দুশ্চরিত্র ডাক্তারের হাত হইতে পরিত্রাণ করুন, ডাকিনীর কুহকপাশ ছিন্ন করিয়া তাকে দূর করিবার ব্যবস্থা করুন। শুনিয়াছি আপনি বিদুষী বুদ্ধিমতী, আপনি ইহা পারিবেন, প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় পত্নীত্বের সতীত্বের অমর্য্যাদা অপমান সহ্য করিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবেন না।

আর আপনি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে সনৎকে রাহুমুক্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আমাকে সংবাদপত্রে সমস্ত কুৎসা

প্রকাশ করিতে হইবে—সে কর্ত্তব্য সনতের বন্ধুর পক্ষে সহজ ও সুখকর না হইলেও দেশের সেবকের করিতেই হইবে।

শরণাগত—
শ্রীপরিতোষ ঘোষাল।

চিঠি পড়িয়া সুবাসিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। তার ইচ্ছা হইতে লাগিল তখনি ছুটিয়া সনতের বাসায় গিয়া দেখিয়া আসে পরিতোষের অভিযোগ কতখানি সত্য। এইজন্যই তার স্বামী অমন উন্মনা হইয়া থাকে, এইজন্যই তার প্রতি আদর সোহাগ অমন প্রাণহীন আবেগশূন্য প্রথা মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। কি করিবে সে, তার ত এখন বাড়ী ছাড়িয়া এক পাও বাহিরে যাইবার জো নাই, তার মাতৃত্ব যে আসন্ন।

সুবাসিনী বসিয়া উদ্বিগ্ন মনে ভাবিতেছে, এমন সময়ে সনৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুবাসিনী তাড়াতাড়ি হাতের চিঠি কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সনৎ আজ মলিনার সঙ্গে সন্ধি হওয়ার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল; তার লঘু মন হাসির হিল্লোলে দোল খাইতেছিল; সে উৎফুল্ল মুখে সুবাসিনীর কাছে আসিয়া তাকে বাহুবেষ্টনে নিজের পাশে টানিয়া লইয়া বলিল—কি গো, কি হচ্ছে?

স্বামীর এই আদর আজ সুবাসিনীর কাছে পরিহাস বলিয়া বোধ হইল, অপরের আদরের হয়ত ইহা উচ্ছিষ্ট প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি বলিয়া মনে হইল; সুবাসিনী আস্তে আস্তে নিজেকে স্বামীর বাহু হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল—আজ সকালে কোথায় খেলে—আমি কতক্ষণ বোসে ছিলাম তোমার জন্যে।

সনৎ খাটের উপর বসিয়া সুবাসিনীকে ধরিয়া পাশে বসাইতে গেল। সুবাসিনী সাম্‌নের চেয়ারে বসিয়া আবার হাসিল। সনৎ বলিল—বেলা হয়ে গেল, তাই বাসাতেই খেলাম।

সুবাসিনী হাসিয়া বলিল—তোমার বাম্‌নি মাগী বুঝি খুব ভালো রাঁধে ?

মলিনার রূপ বয়স ও তার সঙ্গে নিজের স্নেহ-সম্পর্কের সহিত সুবাসিনীর সম্বোধন তুলনা করিয়া সনৎ অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিল ; সে হাসিয়া বলিল—ঐ রাঁধে অম্‌নি একরকম, কোনো-রকমে গেলা যায়।

সুবাসিনী হাসিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাম্‌নীর নাম্‌ কি গো ?

মুহূর্তের জন্য সনতের মুখ অন্ধকার হইয়া আবার হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ; সে বলিল—বাম্‌নীর নামের খবর আবার কে রাখে ?—হ্যাঁ—কি ভালো ওর নাম—মলিনা, না ঐরকম কি একটা।

সুবাসিনী মুখে তেমনি হাসি রাখিয়া বলিল—নামটা কি রূপের সমান ? ভাতের হাঁড়ির তলার মতন কালো ?

সনৎ একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—হ্যাঁ তা বৈ কি, বাম্‌নী আবার কেমন হবে ? আমায় কিছু খেতে দিতে পারো ?

সুবাসিনী উঠিয়া গেল। সনৎ মলিনার শঙ্কাকুল প্রসঙ্গ হইতে অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(২৯)

পরদিন সনৎ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার সময় সুবাসিনীকে বলিয়া গেল, আজ তাকে হুগলিতে রোগী দেখিতে যাইতে হইবে, রাত্রে হয়ত ফিরিতে পারিবে না। সনৎ চলিয়া গেলে সুবাসিনী মলিনাকে চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথমেই তার দুশ্চিন্তা হইল কি বলিয়া মলিনাকে সম্বোধন করিবে। পরিতোষ তাকে ভদ্রে বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, সেই কথাটা মনে পড়িল। না, মলিনার মতন মেয়েকে ত ভদ্র বলা

যায় না। শুভে! না, যে মূর্ত্তিমতী অমঙ্গল তাকে শুভা কি বলা যায়। মহাশয়া? ভালো শোনাইল না। শুধু নিবেদন? চোরের কাছে আবার নিবেদন কিসের? তবে নাম ধরিয়া ডাকা যাক—মলিনা? সেও যে কেমন রূঢ় অভদ্র শোনাইবে। বোন ভগ্নী? ছি! ঐ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক? আয়ুষ্মতী? অমন লোকের আয়ুর কামনা করাও যে অন্যায়। তবে কি? কিছুই না? সুবাসিনী ভাবনার কূল না পাইয়া লিখিল—

মলিনা,

তুমি শুনে থাক্‌বে হয়ত, যে ডাক্তারের আশ্রয়ে তুমি আছ, তাঁর এক স্ত্রী আছে; আমিই সেই ভাগ্যবতী। আমি শুনেছি আমার স্বামী তোমায় ভালোবাসেন, তুমিও হয়ত তাঁকে ভালো বাস। যদি এই জনশ্রুতি সত্য হয়, তবে আমাদের উভয়ের ভালোবাসার পাত্রের মঙ্গলের জন্যে আমাদের দুজনের একবার দেখা হওয়া দর্‌কার। আমার স্বামীর ওপর আমারও ত দাবী আছে; কিন্তু তোমার প্রণয়ের দাবী হয়ত আমার বিবাহের দাবীর চেয়ে বেশী প্রবল। যদি তাই হয়, তবে আমার কেবল মন্ত্র পড়ার জোরের দাবী আমি ছেড়ে দেবো। আমি যেমন সরল চিত্তে স্বামীর মঙ্গল ও সুখ কামনা কর্‌ছি, আশা করি তোমার ভালোবাসাতেও তেমনি সরলতা ও আকুলতা আছে। আমি বাড়ী থেকে নড়্‌তে অক্ষম; তুমি দয়া কোরে বিশ্বাস কোরে একবার এই বাড়ীতে আস্‌বে আশা করি। আজ স্বামী হুগলি যাবেন বোলে গেছেন; সত্যি কি না তুমি আমার চেয়ে বেশী জানো; যদি সত্যি হয় তুমি এসো, তিনি টের পাবেন না।

শ্রীসুবাসিনী দেবী।

সুবাসিনী চিঠি লিখিয়া বাড়ীর চাকরকে দিয়া মলিনাকে পাঠাইয়া

দিল। চাকরকে বলিয়া দিল—বাবুর বাসায় যে বামুন-ঠাক্‌রুণ আছে, তাকে দিবি। জবাব নিয়ে আস্‌বি। যদি সে আস্‌তে চায় গাড়ী কি ট্যাক্‌সি ভাড়া কোরে নিয়ে আস্‌বি।

মলিনা বিকাল বেলা সুবাসিনীর চিঠি পাইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতদিন সে সনতের আছে কাছে, সনতের স্ত্রীর অস্তিত্ব মাঝে মাঝে তার ঈষৎ মনে হইয়াছে, কিন্তু সে তার কথা কিছুতেই স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে পারে নাই। যে ভয়কে সে পরিহার করিয়া চলিতেছিল আজ তাই স্বয়ং আসিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছে, আর ত এ'কে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। কি করা উচিত মলিনা কিছুই হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। আজ সনৎও নাই যে তার কাছে পরামর্শ চাহিবে, সে সত্য-সত্যই আজ হুগ্‌লি গিয়াছে। যার অধিকারে সে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে তার সম্মুখে বিচারের কঠিন দণ্ড লইবার জন্য উপস্থিত হইতে তার সাহস হইতেছিল না। এতদিন পরে আজ তার অন্তরে নিজের আচরণ অত্যন্ত কুৎসিত কদর্য্য হইয়া প্রতিভাত হইল। আজ সে বুঝিতে পারিল সে অন্যায় করিয়াছে, তার আচরণ অশোভন হইয়াছে, সে পরের সম্পত্তি অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মলিনার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—এ জল লজ্জার, আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কার, এ কান্না অসহায়ের শেষ অবলম্বন!

মলিনা চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল ঘরের বাহিরে রাঘবের পশ্চাতে সুবাসিনীর পত্রবাহক অপেক্ষা করিতেছে, জবাব লইয়া যাইতে তার প্রতি মুনিবের আদেশ আছে। এর মুনিব ত তারও মুনিব,—সনৎ ত তার মুনিব ছাড়া আর কেউ নয়, সেই মুনিবের স্ত্রীও মুনিব নয় ত কি? কিন্তু সনৎ কি তার কেবলই মুনিব? না না, সে যে প্রাণাধিক প্রিয়তম, তার ইহকাল পরকাল, তার পুণ্য পাপ, তার জীবনের সর্ব্বস্ব

ধন! আর সনতের স্ত্রী তার কে? তার প্রতিদ্বন্দ্বী, তার শত্রু, তাকে বঞ্চিত করিয়া তার সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত রাক্ষসী! না না, তার দোষ কি, দোষ যদি কারো থাকে ত তারই—সে কোন্ অধিকারে পরধন আত্মসাৎ করিবার লোভ করিয়াছিল? কিন্তু লোভ কি সে বাস্তবিক করিয়াছিল? স্পষ্ট না করিলেও প্রচ্ছন্ন হইয়া লোভ ছিল বৈ কি। যদি নাই ছিল, তবে এতদিনেও সে একবারও সনতের স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করে নাই কেন, বরং তার কাছ হইতে নিজে লুকাইয়া গোপন থাকিতেই চাহিয়াছে। এতেই ত প্রমাণ হয় তার মনে দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন হইয়া ছিল, তার মনে পাপ অস্পষ্ট হইয়া ছিল। এখন তবে বিচারকের দণ্ড বহন করিতে ভয় পাইলে চলিবে কেন? সে ত পলায়নের ও পরিত্রাণের পথ খোলা রাখে নাই!

মলিনা চিঠি কোলে করিয়া ভাবিতে ভাবিতে দেখিল, সুবাসিনীর পত্রবাহক রাঘবকে কি বলিতেছে। রাঘব বলিল—দিদিমণি, এ বল্‌ছে দেরী হয়ে যাচ্ছে, জবাব নিয়ে ফিরে গিয়ে একে রান্নার জোগাড় দিতে হবে।

মলিনা অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া উদাসস্বরে বলিল—চিঠির জবাব! আমি গিয়েই দেবো, একখানা গাড়ী আন্‌তে বলো।

সুবাসিনীর চাকর গাড়ী ডাকিতে বাহির হইয়া গেলে মলিনা রাঘবকে কাতর স্বরে বলিল—রাঘব, আজ ত বাবু আস্‌বেন না, তুমি আমার সঙ্গে একটু যেতে পার্‌বে?

রাঘব মলিনার অশ্রুপ্লাবিত মুখ ও বিষাদকাতর কথা শুনিয়াই বুঝিয়াছিল, একটা কিছু বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়াছে। মলিনা নিমজ্জমান ব্যক্তির তৃণ-আশ্রয়ের ন্যায় নগণ্য সামান্য তারই উপর নির্ভর করিয়া সংসারাবর্ত্তের কঠিন সংঘাতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইতে

চাহিতেছে। রাঘব করুণা ও স্নেহে আর্দ্র স্বরে বলিল—যাব বৈ কি দিদিমণি, তোমায় একলা কার সঙ্গে কোথায় পাঠাব?

(৩০)

সুবাসিনীর চাকর মলিনাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর উপর-তলায় উঠিয়া সুবাসিনীর ঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া মলিনাকে বলিল—এই ঘরে মা আছেন।

মলিনা দরজার এ পারে দাঁড়াইয়া ঘরে ঢুকিতে ইতস্তত করিতে লাগিল—বিচারকের সম্মুখে যাচিয়া দণ্ড লইতে যাওয়া যে বড় কঠিন।

মলিনাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া সুবাসিনীর চাকর আবার বলিল—যান, ভিতরে যান।

মলিনা সেই তাগাদায় অতি কষ্টে শ্রান্ত শিথিল পা তুলিয়া চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

মলিনা ও সুবাসিনীর দৃষ্টি মিলিত হইল। সুবাসিনী মলিনাকে দেখিয়া ঘৃণায় বিরক্তিতে মুখ কুঞ্চিত করিতে যাইতেছিল; কিন্তু অতুলনা সুন্দরী মলিনার জ্যোৎস্নার মতন বর্ণ, হরিণীর মতন সজল চঞ্চল ঈষৎ-বাঁকা টানা চোখের শঙ্কিত দৃষ্টি, সরল শিশুর মতন কোমল কমনীয় নিখুঁত মুখশ্রী দেখিয়া সুবাসিনীর উদ্যত কঠোরতা করুণায় অনুকম্পায় কোমল হইয়া আসিল। মলিনারও ভয়চকিত দৃষ্টি সুবাসিনীর করুণাকাতর স্নিগ্ধ মুখশ্রীতে সন্ধ্যাকালের জুঁই-রজনীগন্ধার সরস আর্দ্র লাবণ্য দেখিয়া শান্ত নিরুদ্বেগ হইল, মলিনার চোখ দিয়া এতক্ষণে ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল—যেন প্রভাতবায়ুর শীতলস্পর্শে এক অঞ্জলি শিউলি-ফুল কি বকুলফুল হঠাৎ ঝরিয়া গেল। তখন বর্ষণক্লান্ত নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশে নীলমেঘের কোলে-কোলে অপরাহ্ণ-সূর্য্যের স্তিমিত আলোক জরির পাড় বুনিতেছিল, এবং নীলমেঘের

প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রৌদ্র মলিনার চোখের জলে ইন্দ্রধনুর রং ফলাইয়া সুবাসিনীর নয়ন মন মুগ্ধ করিতেছিল। একটি বৃন্তচ্যুত বড় পদ্মফুলের মতন মলিনাকে অসহায় নিরালম্ব দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া সুবাসিনী আস্তে বলিল—এস।

এই আহ্বানে সুবাসিনীর দয়ার্দ্র হৃদয় যেন উঁকি মারিয়া গেল। মলিনা সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে সুবাসিনী যে কৌচে হেলিয়া বসিয়া ছিল তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সুবাসিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কি বলিয়া যে সে কথা আরম্ভ করিবে তাহা যেন খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সুবাসিনীর চেয়ে মলিনার অবস্থা আরো অসহ্য নিরাশ্রয় বোধ হইতেছিল। সে নীরব দণ্ডদাতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অজ্ঞাত অদৃষ্টের দুরবগাহ রহস্যে অনাশ্রিত লতার মতন লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল। সুবাসিনী মলিনার দেহে ক্ষণে ক্ষণে শিহরণ দেখিয়া একবার তার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া ধীরে সামনের একখানা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিল—বোসো।

মলিনা চেয়ারে না বসিয়া সুবাসিনীর পায়ের কাছে মাটিতে পাশে পা মুড়িয়া হাতে ভর রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

সুবাসিনী হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—তুমি কোন্ স্বত্বে আমার স্বামীকে কেড়ে নিচ্ছ তাই জান্‌তে তোমায় ডেকেছিলাম।

মলিনা কাতর মুখ সুবাসিনীর মুখের দিকে তুলিয়া ছলছল চোখে বলিল—আমি ত কেড়ে নিইনি। আমাকে অনাথা অনাশ্রিতা দেখে তিনি দয়া কোরে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তাই আমি তাঁকে ভালো না বেসে যত্ন না কোরে থাক্‌তে পারিনি।

সুবাসিনী মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার ভালোবাসা

তাঁরও মনকে যে আকর্ষণ করছে। তার ফল কি হচ্ছে জানো? যাকে তুমি ভালোবাস তার দুর্ণাম রটছে, ডাক্তারের ভরা পসার নষ্ট হচ্ছে। তিনি তোমাকে পাশে নিয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন যদি তুমি মনে করো, তা হলে আমার স্বামীর প্রীতি আর সুখের জন্যে আমি তোমাদের পথ ছেড়ে সোরে যেতে প্রস্তুত আছি।

মলিনা আশা করিয়া আসিয়াছিল সুবাসিনীর নিকট হইতে শুনিবে তর্জ্জন গর্জ্জন তিরস্কার ধিক্কার গঞ্জনা লাঞ্ছনা। কিন্তু তার বদলে তার মুখে এই ত্যাগের বার্ত্তা শুনিয়া মলিনা আশ্চর্য্য অভিভূত নিঃশেষে পরাভূত হইয়া পড়িল; সে সুবাসিনীর মহত্বের প্রভাবে তার পায়ের কাছে নত হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মধ্যে বলিল—না না, আপনি কেন যাবেন, আমিই যাব।

সুবাসিনী মলিনাকে তার পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে দেখিয়া করুণার্দ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া তাকে তুলিতে গেল; কিন্তু তখনি তার মনে পড়িল এ পতিতা, সতীর অস্পৃশ্যা; সুবাসিনী প্রসারিত হাত গুটাইয়া লইয়া বলিল—এ কথা কি তুমি সরল মনে সত্য কোরে বলছ?

মলিনা অশ্রুধৌত মুখ তুলিয়া ব্যাকুল কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল— না না, আমি আপনার কাছে মিথ্যা বলেছি, আমার কাছে মিথ্যা বলেছি—আমি প্রবঞ্চনা করেছি—আমি ওঁকে ছেড়ে যেতে পারব না— তাঁকে আমি ভালোবাসি, তিনিও আমাকে ভালোবাসেন।

সুবাসিনী বেদনাহত স্বরে বলিল—তুমি তাঁকে ভালোবাসতে পারো, কিন্তু তিনি? অমন কথা ত তিনি আমাকে কতশতবার বলেছেন, জিজ্ঞাসা করলে এখনো বলবেন। মানুষ চিরকাল একই মানুষকে সব সময় ভালোবেসে চলতে পারে না; তিনি স্পষ্ট কোরে যদি আমায়

সত্য কথা বল্‌তে পারেন – আমি তোমায় আর ভালোবাস্‌তে পার্‌ছি না, আমি আমার ভালোবাসার পাত্র অন্যত্র খুঁজে পেয়েছি—তবে আমি স্বচ্ছন্দে তাঁর পথ ছেড়ে দাঁড়াব—আমার মন্দভাগ্যের জন্য খেদ হবে, কিন্তু কারো ওপর ক্রোধ কর্‌বার অধিকার আমার থাকৃবে না।

সুবাসিনীর মুখে এই অসাধারণ শান্ত উদার মহৎ বাক্য শুনিয়া মলিনা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তার চোখের অশ্রুধারাও যেন বিস্ময়ে থম্‌কিয়া তার অবাক দৃষ্টির আবরণ অপসারিত করিয়া দাঁড়াইল। সুবাসিনী মলিনাকে নীরব চিন্তাকুল দেখিয়া আবার বলিতে লাগিল—তোমাতে আমাতে যে দ্বন্দ্ব তা সমানে সমানে। কিন্তু স্বামীর যে সন্তান আগন্তুক, তাকে পিতৃনাম ও পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত কর্‌বার অধিকার তোমার আমার তাঁর কারো আছে কি ?

মলিনার চোখ দিয়া আবার জল উপ্‌চিয়া পড়িতে লাগিল। মলিনা ধীরে নীরবে সুবাসিনীর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাকে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সুবাসিনীও এবার উঠিয়া দাঁড়াইল। মলিনা ক্রন্দনকম্পিত অস্পষ্ট স্বরে বলিল—যাই দিদি। যাবার সময় বল্‌ছি বিশ্বাস করুন, আমি তাঁকে ভালোবেসেছি ছাড়া আর কিছু অন্যায় অপরাধ করিনি।

মলিনার কথার হতাশ সুর শুনিয়া মলিনার প্রতি অনুকম্পায় ব্যথিত হইয়া এতক্ষণ পরে সুবাসিনী মলিনার হাত ধরিয়া বলিল—কি ঠিক কর্‌লে মলিনা ?

সুবাসিনীর এই স্পর্শ ও কোমল স্বর আবার মলিনাকে ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল—সে আবেগভরে বলিল—যাব যাব, তাঁকে ছেড়েই যাব।

সুবাসিনী এক হাতে মলিনার পিঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল—কোথায় যাবে ভাই ?

মলিনা দুটি হতাশ চোখের ব্যাকুল দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—তা ত জানিনে। জগতে ত কোথাও আমার আশ্রয় নেই—তবু এ আশ্রয় ছেড়ে আমি যাব।

এতক্ষণে সুবাসিনীরও চোখ দিয়া করুণার মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইল। সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল—আমার মা বাবা কাশীবাস করছেন ; তুমি আমার বোনের মতন তাঁদের কাছে গিয়ে থাকবে ?

নিজের স্বামীর দখল লইয়া যার সঙ্গে দ্বন্দ্ব সেই পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি এ কী আশ্চর্য্য করুণা! মলিনা একেবারে দুই হাতে সুবাসিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া তার উপর মুখ চাপিয়া অশ্রুতে ধুইয়া দিতে দিতে বলিল—না না না, আমি মনের লোভ ত সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারব না, আমি আর তাঁর সম্পর্কের কাছাকাছিও কোথাও থাকব না, আমি একেবারে দূর হয়েই যাব।

সুবাসিনী দুঃখভারাক্রান্ত নীরবতায় উদ্গত অশ্রু আবৃত করিয়া মলিনাকে লইয়া বাহিরের দালানে আসিয়া দেখিল—আসন্ন আষাঢ়ের ঘনঘটা নীলাঞ্জনপর্ব্বতের মতন, ইন্দ্রদেবের ঐরাবত হস্তীর মতন, যমের মহিষের মতন, ধূর্জ্জটীর বিষদিগ্ধনীলকণ্ঠের মতন পশ্চিমের আকাশটাকে জুড়িয়া পিনাকীর প্রলয়বিষাণ ও ইন্দ্রদেবের দম্ভোলি মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিতেছে।

সিঁড়ির মুখের কাছে অসিয়া সুবাসিনী বলিল—এই দুর্যোগে যাবে কি কোরে ভাই ?

মলিনা অশ্রুসমাচ্ছন্ন মুখ বিষণ্ণ হাসিতে উজ্জ্বল করিয়া বলিল—আমার

জীবনও ত দুর্যোগ দিয়েই আগাগোড়া আচ্ছন্ন দিদি। দুর্যোগকে আমার ভয় করলে ত চলবে না।

মলিনার সেই হতাশ হাসি সুবাসিনীর মর্ম্মে গিয়া বিঁধিল। সে নীরবে মলিনাকে ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মলিনা সিঁড়িতে নামিতে যাইবে এমন সময় ভীষণ বজ্রনাদ হইল। মলিনা থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং সিঁড়ির বাঁক ঘুরিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে মলিনার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল সনৎ।

সনৎ হুগলি হইতে শীঘ্র ফিরিয়া হাবড়া হইতে নিকট বলিয়া সরাসরি বাড়ীতে আসিয়াছিল; সুবাসিনী আসন্নপ্রসবা বলিয়া সনৎ তাকে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইতে পারে নাই। সে সিঁড়িতে যখন উঠিতেছিল তখন বজ্রশব্দে তার পায়ের শব্দ সুবাসিনী ও মলিনা শুনিতে পায় নাই, তাদের মৃদু স্বরও সনৎ শুনিতে পায় নাই। এখন উভয়ে হঠাৎ মুখোমুখী দাঁড়াইয়া সনৎ ও মলিনা দুজনেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। সনৎ মলিনাকে একটি বাসিফুলের মতন ম্লান দেখিয়াও তার উপর রাগে একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল। যে বস্তুকে সে এতদিন গোপন রাখিয়া অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, সেই প্রবঞ্চনার লজ্জা সনৎকে আর কোনো কথা চিন্তা করিবার অবসর দিল না—সে শুধু দেখিল মলিনা তার স্ত্রীর কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সনৎ বেগে উপরে উঠিয়া আসিয়া দুই চোখ পাকাইয়া লাল করিয়া রুক্ষ রুষ্ট স্বরে মলিনাকে বলিল—তুমি এখানে কী মৎলবে এসেছ? নচ্ছার মেয়েমানুষদের গতিবিধি সর্ব্বত্র। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ীতে তোমাদের মতন লোকের আসার স্পর্দ্ধা জুতো মেরেই দূর করতে হয়।

সনৎ স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ার লজ্জা ক্রোধের উগ্রতা দিয়া চাপা দিবার চেষ্টায় যে রূঢ় বাক্য হঠাৎ উচ্চারণ করিয়া ফেলিল তাহা তার কানেই

অত্যন্ত কঠিন হইয়া বাজিল, তার নিজের অপরাধ স্ত্রী ও মলিনা দুজনের কাছেই তুল্য প্রবল হইয়া পড়িল। সঙ্কোচে অপ্রতিভ সনৎকে চমৎকৃত করিয়া শান্ত স্বল্পবাক্ মলিনা দৃপ্ত ভঙ্গীতে ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সনৎকে বিদ্ধ করিয়া স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া বলিল—অসহায় নিরাশ্রয় লোককে অপমান করা খুব সহজ, নয়? আপনি জানেন আপনি মিথ্যা অপবাদে আমাকে অপমান করছেন· আর আমি যদি দোষী হইও তা হলে আপনি নিষ্কৃতি পান না। আপনার আচরণের লজ্জাকে জুতো মেরে দূর করবার কষ্ট পেতে হবে না, সে নিজেই দূর হয়ে যাচ্ছে।

এতদিনের সঙ্কোচে-কুণ্ঠিত লজ্জায়-মৃদু নম্রতায়-ললিত মলিনা আজ অপমানের আঘাতে মহীয়সী মহারাণীর মতন দেহ ঋজু মাথা উন্নত মুখ দৃপ্ত পদক্ষেপ দৃঢ় করিয়া সিঁড়ি নামিয়া চলিয়া গেল। সনতের তিরস্কারের তর্জ্জন শুনিয়া রাঘব ভয়ার্ত্ত মুখে সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মলিনা নামিয়া আসিতেই সেও সঙ্গে সঙ্গে গিয়া গাড়ীতে চড়িল। মলিনার চক্ষু শুষ্ক, মুখে জ্বালা। সে জটপাকানো ভাবনার গোলকধাঁধায় পথ হারাইয়া ঘুরিয়া মরিতেছিল, নির্দ্দিষ্ট কিছুই ভাবিবার মতন মনের অবস্থা তখন তার ছিল না।

(৩১)

মলিনা চলিয়া গেলে সুবাসিনী লজ্জিত স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল—ঘরে এস।

সনৎ সুবাসিনীর সঙ্গে-সঙ্গে ঘরে গিয়া সুবাসিনীর আকর্ষণে তারই পাশে কৌচে বসিয়া পড়িয়া মুখ অন্ধকার করিয়া রহিল, স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সুবাসিনী কোমল স্বরে বলিল—আমিই মলিনাকে ডেকে এনেছিলাম· একজন স্ত্রী বা পুরুষ দুজন পুরুষ বা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে দুজনের কাছেই তার কর্ত্তব্যহানি ঘটে, তার মনুষ্যত্বের ত্রুটি

হয়। তাই আমি মলিনাকে ডেকেছিলাম স্থির করতে তোমার কাছে সে থাক্‌বে, না আমি থাক্‌ব। সে স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে সহজে তার—হয়ত আমার দাবীর চেয়েও বড় প্রবল—দাবী আমার প্রথম আর সামাজিক দাবীর জন্যে ত্যাগ কোরে চোলে যাচ্ছিল; সেই লোককে অপমান করা তোমার উচিত হয়নি।

সনৎ মুখ ঘুরাইয়াই বসিয়া রহিল, কোনো কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু মলিনার প্রণয় যে এমনি মহৎ ত্যাগে সমর্থ তাহা সে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া নিজের আচরণে ও মলিনার বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় কাতর হইয়া পড়িল।

সুবাসিনী বলিতে লাগিল—অপরাধ ত তোমার দিক থেকেই প্রথম আরম্ভ হয়েছিল। প্রথম যখন মলিনাকে আশ্রয় দিয়েছিলে তখনই তুমি তার কথা আমার কাছে গোপন রেখেছ—সে ত তার প্রতি প্রথম দর্শনেই প্রণয়ের গোপনতা নয়, তার মধ্যে লোভের হীনতা ছিল। তোমার মন শুদ্ধ শুচি থাক্‌লে তুমি তার কথা আমার কাছে গোপন রাখ্‌তে না; তাকে বাসায় না রেখে আমার কাছেই এনে রাখ্‌তে—তুমি জানো আমি ক্ষুদ্রচিত্ত স্ত্রীলোকের মতন হিংসুটে ঈর্ষান্বিত নই। আমার কাছে থেকেও তোমাদের দুজনের প্রণয় হতে পার্‌ত, কিন্তু তাতে তোমাদের সামাজিক নিন্দা হত না, এতটা অনাচার করতে তোমাদের দুজনেরই দ্বিধা হত।

এইবার সনৎ স্ত্রীর অভিযোগের উত্তর করিল—না না সুবাস, মলিনার চরিত্রে কোনো কিছু কলুষ স্পর্শ-করেনি, তার মন পবিত্র, দেহ পবিত্র—সে বড় ভালো মেয়ে। যদি একটুও কলুষ ছুঁয়ে থাকে তাকে, তবে সে আমারই মনের প্রচ্ছন্ন লালসার জন্যে।

সুবাসিনী অন্তরে অন্তরে পরম স্বস্তি ও সন্তোষ অনুভব করিল, মলিনার ও স্বামীর উপর তার শ্রদ্ধা দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। সে তৃপ্তির

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তবে ত তাকে কটু কথায় অপমান করা তোমার দ্বিগুণ অন্যায় হয়েছে। তুমি যাও, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে এস।

সনৎ স্ত্রীর কথায় আশ্চর্য্য হইয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তুমি এখনো আমায় বিশ্বাস কোরে তার কাছে আবার পাঠাতে চাচ্ছ?

সুবাসিনী ম্লান মুখে ঈষৎ হাসিয়া বলিল—বিশ্বাস? তোমাকে বিশ্বাস খুবই করি—তোমায় আমি ভালোবাসি বোলে, তুমি আমায় ভালোবাস বোলে; কিন্তু তোমার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি সেই তেজস্বিনীকে—যে এতবড় মহৎ প্রলোভনেও নিজেকে পবিত্র রাখ্‌তে পেরেছে, এত বড় মহৎ ত্যাগ স্বীকার করতে পেরেছে। তুমি যাও—এখনি যাও—দেরী হলে ক্ষমা চাইবার অবসর হয়ত থাক্‌বে না, সে মেয়ে তোমার বাসায় আর বেশীক্ষণ থাক্‌বে বোলে ত বোধ হয় না।

সনৎ সুবাসিনীর কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল—মলিনা তার আশ্রয় তার সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া যাইবে, কিন্তু কোথায়—সে কোথায়? তার যে পৃথিবীতে কেউ আত্মীয় বন্ধু সহায় নাই, কোথাও তার যে আশ্রয় নাই। সনৎ কাতর অনুতপ্ত হইয়া মলিনার কাছে ক্ষমা চাহিয়া তাকে সুবাসিনীর কাছে আসিয়া থাকিবার অনুরোধ করিতে ছুটিল।

পরিতোষ সুবাসিনীকে চিঠি লিখিয়াই তার এক বন্ধুকে দিয়া সনৎকে হুগলিতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। সনৎ হুগলিতে রওনা হইয়া গেলে পরিতোষ সনতের বাসার কাছে ঘুরঘুর করিতেছিল সুবাসিনীকে চিঠি লেখার ফলের সন্ধানে। অনেকক্ষণ অসহ্য অপেক্ষার পর পরিতোষ দেখিল সুবাসিনীর চাকর আসিল, মলিনাকে লইয়া সে ও রাঘব সাল্‌কিয়ায় চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিতোষও বেনামীতে সনৎকে জরুরী টেলিগ্রাম করিয়া দিল—সাল্‌কিয়ার বাড়ীতে এস, বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। এবং

নিজে একখানা ট্যাক্‌সি ভাড়া করিয়া সাল্‌কিয়ায় গিয়া সনতের বাড়ীর একটু তফাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে দেখিল তাকে উৎফুল্ল করিয়া ঠিক-সময়েই সনৎ বাড়ীতে ফিরিল। কৌতূহলী হইয়া সনতের বাড়ীর কাছে আসিতেই পরিতোষ শুনিল সনতের তিরস্কারের চীৎকার। তারপরই দেখিল তীব্রতেজে-প্রদীপ্ত-শ্রী মলিনাকে লইয়া রাঘব কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। পরিতোষের ট্যাক্‌সিও মলিনার গাড়ীর পিছনে পিছনে ছুটিল।

মলিনা বাসায় ফিরিয়া নিজের ঘরে গিয়া আকাট আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া পড়িল। বজ্রবেদনার গুরু আঘাতে তার চৈতন্য ও অনুভূতি যেন আচ্ছন্ন আবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তার মন একেবারে ফাঁকা, চিন্তা একেবারে বস্তুশূন্য বিশৃঙ্খল। এই আশ্রয় ছাড়িয়া তাকে যাইতে হইবে, আজই, এখনি, এই সে জানে—এই চিন্তাই তার সমস্ত সংজ্ঞাকে আবৃত করিয়া আছে, কিন্তু কোথায় যাইবে কেমন করিয়া, তাহা সে ভাবিতেছিলও না, ভাবিয়া কূল পাইবারও কথা নয়।

পরিতোষ মলিনার বাসার কাছে আসিয়া একবার এদিক-ওদিক উঁকি মারিল। দেখিল রাঘব ঘাঁটি আগ্‌লাইয়া সে তল্লাটে কোথাও নাই।

তখনি তার মনে পড়িল রাঘবের উপর মলিনার আদেশ—দ্যাখ্‌ রাঘব, পরিতোষ-বাবু যদি এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসে, তাকে গলা-ধাক্কা দিয়ে দূর কোরে দিবি।

পরিতোষের অপমানে ও রাগে কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি শাস্ত্রবচন আওড়াইয়া মনকে সান্ত্বনা দিল—অপমানং শিরস্কৃত্বা স্বকার্য্যম্‌ উদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ। এবং সান্ত্বনা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বেগে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। পরিতোষ পথে বাধা পাইবার ভয়ে আশে-পাশে চাহিতে চাহিতে একেবারে মলিনার ঘরে গিয়া ঢুকিল। দেখিল

মলিনা আঘাতের আতিশয্যে একরকম সংজ্ঞাহারা হইয়া নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছে। পরিতোষ ঘরে ঢুকিলেও মলিনা কেবল একবার কাতর উদাস দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া যেমন ছিল তেমনি বসিয়া রহিল, ক্রোধ বিরক্তি অথবা আশা সান্ত্বনা কোনো ভাবই তার মুখে প্রকাশ পাইল না। মলিনাকে স্তব্ধ দেখিয়া সাহস পাইয়া পরিতোষ তার কাছে গিয়া বসিয়া বলিল—সনৎ নাকি তোমায় খুব অপমান করেছে শুন্‌লাম, তাই ছুটে না এসে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার্‌লাম না। তোমায় বারবার কোরে বল্‌ছি তুমি আমার বাড়ীতে চলো, মাথায় তুলে রাখ্‌ব, তা ত শুন্‌বে না। যাবে? গাড়ী আন্‌ব?

মলিনা এমন করিয়া পরিতোষের দিকে চাহিল যেন সে পরিতোষের ভাষা বুঝিতে পারে নাই, যেন কালাবোবা সে, বুঝিবার ও প্রকাশের ক্ষমতায় বঞ্চিত।

পরিতোষ আবার বলিল—তুমি মনে কোরো না আমি কেবল নিজের স্বার্থের জন্যেই ব্যস্ত। তুমি যদি সনৎকে ছেড়ে যেতে কষ্ট বোধ করো এখনো, তবে সনৎ তোমাকে যেসব চিঠি লিখেছে সেইগুলো আমার হাতে একবার দাও দেখি, সে কেমন কোরে তোমায় তাড়ায় আমি দেখে নেবো। ঐসব চিঠি আমি কাগজে ছেপে দেবার ভয় দেখালে ওর সাধ্য হবে না তোমায় কিছু বল্‌তে। ও তখন তোমার দাস হয়ে থাক্‌বে।

এত কথার জাল ছড়াইয়াও পরিতোষ মলিনার মনের সন্ধান পাইল না, তাহা যে কোন্ ভাবনার অতল সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে তার আর ঠিক নাই। মলিনার চেতনা ফিরাইবার জন্য পরিতোষ পকেট হইতে পাতলা কাগজে মোড়া একটা কি জিনিস বাহির করিল। মলিনার চোখের সাম্‌নে কাগজের খুব খড়মড় শব্দ করিয়া মোড়ক খুলিয়া পরিতোষ বাহির করিল একটা সবুজ মখ্‌মলের বাক্‌স; তার ঢাক্‌নি খুলিয়া একছড়া নকল

হীরা-চুনি-পান্নার হার বাহির করিয়া মলিনার সাম্‌নে রাখিয়া দিল। মলিনা ফ্যালফ্যাল করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময়ে সদর রাস্তায় বাসার দরজায় একখানা গাড়ী থামিবার শব্দ শুনিয়া পরিতোষ চমকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হারের বাক্‌সটায় ডালা বন্ধ করিয়া সেটাকে মলিনার বালিসের তলায় লুকাইয়া রাখিয়া দিয়া পরিতোষ বলিল—আমি এখন চল্‌লাম। তোমার মতি স্থির কর্‌বার সাহায্য হবে বোলে আমার প্রীতি আর শুভেচ্ছার সামান্য একটু চিহ্নস্মৃতি তোমার কাছে রেখে গেলাম। আমি তোমার উত্তরের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাক্‌ব।......

পরিতোষ ঘর হইতে বাহির হইয়া চোরের মতন থামের আড়ালে-আড়ালে গলিঘুঁজির মধ্যে আত্মগোপন করিতে করিতে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইয়া রাঘব বা সনতের অজ্ঞাতসারে বাড়ী হইতে পলায়ন করিল।

(৩২)

সনৎ বাসায় আসিয়াই সরাসরি একবারে মলিনার কাছে যাইতে পারিল না। সে নিজের ঘরে গিয়া অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। এ বাড়ী যেন তার সমস্ত সুখ ও আনন্দের সমাধি।

পরিতোষ সনতের চিঠির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া চলিয়া গেলে মলিনা উঠিয়া বাক্‌স হইতে সনতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া আনিল। তার মা কালীঘাটে গিয়া একটি কড়িবসানো বাক্‌স কিনিয়া দিয়াছিলেন; সেইটি ছিল মলিনার প্রধান ও প্রিয় সম্পত্তি; মলিনা তারই বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ লাভ সনতের চিঠিগুলি, প্রণয়ের প্রতিকৃতি গোলাপী ফিতার গ্রন্থিতে বাঁধা, শুষ্ক বকুলমালার সৌরভে ভুরভুর। মলিনা সেই গ্রন্থি মোচন করিয়া প্রথম চিঠিখানা পড়িতে লাগিল।

"সবার চেয়ে প্রিয়, অমৃতের চেয়েও অমিয়! তুমি প্রাণের মতন আপন, প্রাণের মতনই গোপন! যতক্ষণ কাছে থাকো বুঝতে পারি না তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। দূরে গেলেই বুঝতে পারি তুমিই সব, তুমিই সব, তুমিই সব! বন্দী হয়ে বুঝতে পারছি আমার মন কোন্ আকাশের বিহঙ্গ, কোন্ সুরসরিতের মৎস্য! কবে মুক্তি পাব জানি না, কিন্তু বন্দীর মন নিরন্তর অনুক্ষণ ধ্যান করবে মুক্তির শুভমুহূর্ত্ত!— তোমারই প্রণয়মুগ্ধ সনৎ!"

এই চিঠি আজ মলিনার মনে হইতে লাগিল স্বপ্নের কুহকমায়া, মিথ্যার প্রলাপ! কিন্তু তবু এই চিঠিগুলি তার পরম প্রিয়! মলিনা চিঠিখানি কোলের উপর মেলিয়া ধরিয়া শূন্য দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাঘব আসিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিতেই চমকিত হইয়া সনৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর আস্তে আস্তে মলিনার ঘরের দিকে চলিল। মলিনার ঘরের সাম্‌নে গিয়া সনৎ আবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, সে মলিনার সম্মুখে যাইতে কিছুতেই সাহস পাইতেছিল না। অনেকক্ষণ যাই কি না যাই করিয়া সনৎ মলিনার ঘরে ঢুকিয়া বিদ্যুতালোকের চাবি টিপিয়া দিল, ঘরের অন্ধকার হঠাৎ-আলোয় চম্‌কিয়া ঘাঁজে-ঘোঁজে সরিয়া দাঁড়াইল। মলিনা কিন্তু চম্‌কাইল না, সে শূন্য দৃষ্টি আস্তে আস্তে তুলিয়া সনতের মুখের দিকে চাহিয়া আবার মুখ নত করিল। সনৎ দেখিল মলিনার কোলে মেলা রহিয়াছে তারই চিঠি! সনৎ লজ্জায় অনুতাপে ধিক্কারে ম্রিয়মাণ সঙ্কুচিত হইয়া আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিল— মলিনা, আমার অপরাধ ক্ষমা করো, আমি কাতর হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

একটা অনেকক্ষণের চাপা নিশ্বাস মলিনার বুক ঠেলিয়া বাহির হইয়া

গেল। মলিনা শান্ত স্বরে বলিল—আপনি জানেন কিনা যে আমি আপনাকে এমন ভালোবাসি যে ক্ষমা না কোরে পার্‌ব না, তাই সেই সহজলভ্য ক্ষমা চাইতে এসেছেন! কিন্তু ক্ষমা পেলেই আপনার সব ত্রুটি সংশোধন হয়ে যাবে? অন্তরাত্মা বেশ নিশ্চিন্ত হতে পার্‌বে?

সনৎ সেই লাজুক নীরব মলিনাকে মুখরা দেখিয়া আশ্চর্য্য ও লজ্জিত হইয়া বলিল—না, নিশ্চিন্ত হতে পার্‌ব না, তবে আমার দণ্ডের দুঃখভার সহনীয় হবে।

মলিনা ম্লান হাসিতে সনৎকে নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিয়া বলিল—কিন্তু আমার দণ্ড অসহ্য অনন্ত বোলেই আমি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ হয়ে দুঃখকে বরণ কোরে নিতে পেরেছি।

সনৎ কাতর মিনতির স্বরে বলিল—মলিনা, তুমি সুবাসিনীর কাছে থাক্‌বে চলো, সুবাস তোমায় নিয়ে যেতে বলেছে......

মলিনা তেমনি শান্ত ভাবে উত্তর করিল—দিদি দেবতা, তাঁকে আমি প্রণাম কোরে বিদায় নিয়ে এসেছি—আপনার সম্পর্কে আর থাক্‌ব না বোলে। আমার জীবনের যথাসর্ব্বস্ব এই চিঠিগুলি আমার কাছে রাখাও আর ঠিক হবে না, আমি নিজে ওগুলিকে নষ্ট কর্‌তেও পার্‌ব না; আপনিই দিয়েছিলেন, আপনিই ফিরে নিন......

মলিনা চিঠিগুলিকে ভাঁজ করিয়া খামে ভরিয়া ফিতা দিয়া বাঁধিতে লাগিল। সেই অবকাশে সনৎ কাছে সরিয়া গিয়া মলিনার হাত ধরিতে গেল। মলিনা হাত সরাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমি মনে কর্‌ব আমি বিধবা—আপনাকে পরলোকগত মনে কোরেই আমি আজীবন ভালোবাস্‌ব। আপনি তারকেশ্বরের লোকের কাছে একদিন স্বীকার করেছিলেন আমি আপনার স্ত্রী! সেই সৌভাগ্য কিছুতেই আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না।

মলিনা চিঠিগুলি বাঁধিয়া সেইগুলি সনতের দিকে বাড়াইয়া ধরিল। সনৎ হাত বাড়াইয়া চিঠি লইবার ছলে মলিনার হাত স্পর্শ করিতে গেল; মলিনা আবার সন্তর্পণে হাত সরাইয়া লইল। সনৎ বুঝিল মলিনা তাকে ত্যাগ করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। যাকে সে মূঢ়ের মতন দূর করিতে চাহিয়াছিল সেই যে সেই দণ্ড এমন করিয়া ফিরাইয়া শাস্তি দিবে এ ত তখন সে বুঝিতে পারে নাই। এ যে নিজের দণ্ডে দণ্ডিত হওয়া, এর ক্ষোভ যে অতীব দুঃসহ। সনতের অবশ হাত নিজের চিঠির মিথ্যা চাটুবাণীর ভারে শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, তার মাথা বেদনা ও লজ্জার ভারে অবনত হইয়া পড়িল।

মলিনা দূর হইতে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—এখন আপনি যান, আপনি এ বাড়ীতে থাক্‌লে আমার যাওয়া বড় কঠিন হবে। কাল এসে জিনিসপত্র বুঝে নেবেন...

মলিনার এই শেষ কথা সনৎকে যেন বিদ্রূপ করিয়া গেল। সে বলিতে চাহিল—এ সমস্ত জিনিসই ত তোমার মলিনা! কিন্তু যে লোক নিজের হাতে হৃদয় ছিঁড়িয়া পায়ে দলিয়া যাইতেছে তাকে তুচ্ছ বস্তুর লোভ দেখাইতে সনতের প্রবৃত্তি হইল না। সনৎ কণ্ঠের কাছে জমা কান্নার ভিতর হইতে ছাঁকিয়া তুলিয়া কেবল এই দুটি কথা বলিতে পারিল—কোথায় যাবে?

মলিনা সনতের কাতরতায় সুখে হাসিয়া বলিল—তা ত জানি না—বিধাতার আর-এক নাম অ-দৃষ্ট!

এই নিরাশ্রয় অনিশ্চিত অবস্থায় নিজের বিপদকে লইয়া এমন পরিহাস সনতের কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বিষম ভয়ঙ্কর বোধ হইল। সে রুমালে কপালের ঘাম মুছিয়া পকেট হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া মৃদু স্বরে বলিল—এই চিঠিটা তোমার মার। তিনি মরবার

সময় পুঁটি-মাসীকে দিয়েছিলেন; পুঁটি-মাসী মরবার সময় আমায় দিয়ে গিয়েছিল; আমি আজ তোমার কাছে মরছি—আমি আজ তোমায় দিয়ে চল্‌লাম......

সনৎ আর বলিতে পারিল না, চিঠিখানা মলিনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া রুমালে মুখ চাপিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মলিনা অশ্রুজালের ভিতর দিয়া সনতের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল; সনৎ যেই অদৃশ্য হইয়া গেল, অমনি মলিনা তার মার চিঠির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আর্ত্তস্বরে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল—মা! মা! মাগো!.. ...

(৩৩)

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া হাল্কা হইয়া মলিনা উঠিয়া বসিয়া দেখিল রাঘব বাহিরে দেয়ালে ঠেসান দিয়া হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মলিনা উঠিয়া মায়ের চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

কল্যাণীয়াসু,

তোমার মাকে তুমি জ্ঞান হওয়া অবধি পরের বাড়ীর রাঁধুনীই দেখেছ; কিন্তু তার অবস্থা চিরকালই এমন ছিল না, তারও বাড়ীতে এককালে রাঁধুনী চাকর দাসী সবই ছিল। যে বছর তোমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন, সেই বছর গাঁয়ের বামাচরণ চক্রবর্ত্তী কমিশেরিয়েটের ভাণ্ডার লুটে গাঁয়ে এসে বস্‌ল। তার প্রতিবাসী নটবর ঘোষাল তার স্ত্রীর সাহায্যে বামাচরণের লুটের ভাণ্ডার লুট করতে লাগ্‌ল। শেষে নিঃসন্তান বামাচরণ যেদিন মর্‌ল সেদিন নটবর দয়া কোরে টাকা সাহায্য করাতেই বামাচরণের অন্ত্যেষ্টি কাজ হতে পেল। নটবর যে ঘটা কোরে বামাচরণের শ্রাদ্ধ তার এক জ্ঞাতিকে দিয়ে করালে তাতে গাঁয়ের

ব'মুনরা এমন ভোজ খেলে যে তার তলায় নটবরের সব নিন্দা চাপা পোড়ে গেল। নটবর তখন গাঁয়ের মাতব্বর ধনী। নটবরের এক ছেলে ছিল, তার নাম ছিল পাঁচুগোপাল। আমাকে হঠাৎ অসহায় দেখে নটবর এসে আমায় বল্‌লে—যদি তুমি রাজি হও পাঁচুর সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দি। তারা আমাদের ঠিক ঘর নয়, তোমারও বয়স তখন সবে আট বছর, তাতে আবার ছেলের মার কুখ্যাতি রটেছিল; কাজেই আমি ইতস্তত করতে লাগ্‌লাম। আমাদের আপনার বল্‌তে গাঁয়ে কেউ ছিল না; সবাই নটবরের টাকার জয়কেতে; তারা সবাই জেদ কোরে বোঝাতে লাগ্‌ল—তোমার ছেলে নেই, আর মেয়ে নেই, হলেই বা অঘর; পাঁচুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও, মেয়ে সুখে থাক্‌বে, তুমি অভিভাবক পাবে। গাঁসুদ্ধ লোকের জেদে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরই আমার বেয়াই সম্পর্কের সুযোগে আমার বাড়ীতে অসময়ে যখন-তখন এসে এমন উপদ্রব আরম্ভ কর্‌লে যে তার বশ সেই গাঁয়ে থাকা আমার ভার হয়ে উঠ্‌ল। বেয়াই শেষকালে স্পষ্ট বল্‌লে যে আমি সুদ্ধ তার বাড়ীতে গিয়ে না থাক্‌লে সে আমার মেয়েকেও ঘরে নেবে না, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

আমি ঘৃণায় গাঁ ছেড়ে কল্‌কাতায় পালিয়ে এলাম; মনে কর্‌লাম আমার মেয়ে বিধবাই হয়েছে। তুমি বিধবা হয়েছ বোলেই তোমাকে হয়ত বোঝাতাম। কিন্তু মনে হল স্বামী থাক্‌তে বিধবার আচরণ করালে যদি তোমার পাপ হয়, তোমার অকল্যাণ হয়! তখন আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম তোমার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে!

কল্‌কাতায় এসে আমি রাঁধুনীর কাজ নিলাম, আমার বাপের বাড়ীর পুরোনো ঝি পুঁটি তখন কল্‌কাতায় ছিল, সেই আমায় আশ্রয়

দিলে। তখন ভাবলাম আমার জীবন যদি এমনি দাসীপনায় কাটে তবে তোমার কি দশা হবে? তুমি যাতে ভদ্রভাবে থাকতে পারো তার উপায় হবে বোলে তোমায় স্কুলে পড়তে দিলাম—লেখাপড়া শিখলে যা হোক একটা কিছু উপায় তোমার ভালোই হবে।

যদি কখনো নিরুপায় বোধ করো তবে তোমার স্বামীর আশ্রয় নিয়ো—সে যদিও আবার বিয়ে করেছে, তবু নিজের স্ত্রীকে একেবারে ফেলতে পারবে না। তোমার স্বামীর নামটা তার অপছন্দ হওয়াতে সে এখন নাম বদলেছে—এখন তার নাম পরিতোষ ঘোষাল, সে কলকাতাতেই খবরের কাগজের কাজ করে। তুমি তার নাম জানো, কিন্তু তোমার স্বামীর নাম আগে যা ছিল তাকেই স্বামী বোলে জানো বোলে এই পরিতোষ যে তোমার স্বামী, তা তুমি জানো না। আমি তার চেহারা বর্ণনা করছি—তুমি মিলিয়ে নিয়ো।—ইত্যাদি।

সেই চিঠিতে পরিতোষের বর্ণনা পড়িয়া মলিনার মন নিঃসন্দেহ হইল যে এই পরিতোষই তার এতকালের নিরুদ্দিষ্ট স্বামী। মলিনা মার চিঠি কোলে করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তার পর উঠিয়া পরিতোষকে চিঠি লিখিল—

শ্রীচরণকমলে প্রণাম ও নিবেদন,

আপনি ডাক্তার-বাবুর চিঠি চেয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে আমায় আশ্রয় দিতে বাধ্য করবার জন্যে। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমাকে আশ্রয় দিতে এখনো সম্মত আছেন, আমিই স্বেচ্ছায় সে দান প্রত্যাখ্যান করছি। সুতরাং কাউকে বাধ্য করবার আবশ্যক নেই বোলে ডাক্তার-বাবুর চিঠি তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়েছি।

আজ আমার মার একখানা চিঠি পেলাম, তিনি মরবার আগে লিখে

রেখে গিছ্‌লেন। তাতে আমার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর পরিচয় আছে।* সে চিঠি আপনাকে পাঠালাম।

এখন যা কর্ত্তব্য কর্‌বেন। আপনি আমাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবার আগ্রহ ও চেষ্টা বহুদিন থেকে কোরে আস্‌ছেন। যদি এখনো সে প্রবৃত্তি থাকে নিয়ে যাবেন, আমি আপনার ও আপনার স্ত্রী-পুত্রদের সেবা আশ্রিতা দাসীর মতন প্রাণপণে কর্‌ব। স্ত্রীর অধিকার থেকে আপনি আমায় বঞ্চিত করেছিলেন, তা আর ফিরিয়ে দিতেও পার্‌বেন না, পাবেনও না। আপনি যে হীরার হার ঘুষ দিয়ে গিয়েছিলেন, ফেরত পাঠালাম, তার আমার দর্‌কার নেই।

হতভাগিনী মলিনা।

চিঠি লিখিয়া মলিনা বাহিরে আসিয়া রাঘবকে বলিল,—রাঘব, এই চিঠি আর এই মোড়কটা নিয়ে গিয়ে তোমাদের বাবুর সেই যে বন্ধু আগে আস্‌তেন এখানে, তাকে দিয়ে এসো; তিনি যদি কিছু জবাব দ্যান জিজ্ঞাসা কোরে নিয়ে এসো।

রাঘব উঠিয়া মলিনার হাত হইতে চিঠি ও কাগজ-মোড়া হারের বাক্‌সটা লইয়া আশ্চর্য্য হইয়া মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কাকে দেবো? পরিতোষ-বাবুকে?

মলিনার মুখ লজ্জায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে মাথা নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ।

মলিনা এতদিন পরিতোষের নাম স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাকে স্বামী বলিয়া জানার পর আর সে তার নাম মুখে আনিতে পারিল না। মলিনার এই লজ্জা ও সঙ্কোচ দেখিয়া রাঘব প্রথমে ভাবিল—একদিন মলিনা পরিতোষকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিতে চাহিয়াছিল, আজ তার সেই ক্রোধ ও ঘৃণাই বুঝি তাকে

পরিতোষের নাম উচ্চারণে বাধা দিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই রাঘব মলিনার ভাব যে ক্রোধ-ও-ঘৃণা-ব্যঞ্জক নয়, তাহা বুঝিতে পারিয়া সন্দেহে বিরক্ত হইয়া রুষ্ট স্বরে বলিল—ওই বদ লোকটার কাছে তুমি আবার কি চিঠি লিখ্‌ছ দিদিমণি?

মলিনা লজ্জিত মুখ নত করিয়া ম্লান বিষণ্ণ হাসিতে লজ্জাকে সুন্দরতর করিয়া বলিল—আজ আমি টের পেয়েছি ওঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে হয়েছিল।

রাঘব সন্দেহে অবিশ্বাসে অনিশ্চিত দ্বিধার বিরক্তিতে মুখ বাঁকাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। সে ভাবিল নিরাশ্রয় মলিনা পরিতোষের কাছে আশ্রয় লইবার লজ্জা এই মিথ্যা কথায় ঢাকিতে চাহিতেছে। কিন্তু নিরাশ্রয় হইলেও মলিনা যে ঐ বদ লোকটার কাছে আশ্রয় লইবে ইহা রাঘবের কিছুতেই ভালো লাগিতেছিল না।

(৩৪)

পরিতোষ মলিনার চিঠি পাইয়া পরম উৎফুল্ল ও উল্লসিত হইয়া উঠিল। তার ভাব দেখিয়া রাঘব আর-একবার মাথা নাড়িয়া হাত উল্টাইয়া বুঝাইল যে সে ব্যাপারটা ভালো বুঝিতেও পারিতেছে না, যেটুকু পারিতেছে তাহাও ভালো ঠেকিতেছে না।

পরিতোষের বিকশিত দন্ত চিঠি পড়িতে পড়িতে ক্রমেই ঢাকিয়া আসিতে লাগিল। তার চোখের আনন্দ ক্রমে বিস্ময় হইতে বিরক্তিতে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। সমস্ত চিঠি পড়া শেষ করিয়া পরিতোষ ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর মতন চিঠি দুখানা কুটি-কুটি করিয়া ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—Damn Destiny! Damn it and damn it and damn it thousand times!......বেরো আমার বাড়ী

থেকে বুড়ো রাস্কাল! তোর মলিনা-ঠাকৃরুণকে বলিস্—আমায় গলাধাক্কা দিয়ে দূর করবে বলেছিল, তা কি মনে নেই? আমার বাড়ী-মুখো হলো তার ঐ দশা করব!......

রাঘব খুসী হইয়া সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব মিটাইয়া সন্তোষে হাসিমুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল।

পরিতোষ তখনো ঘরময় আস্ফালন করিয়া দাপাদাপি করিতেছিল—মলিনাটা শেষকালে আমারই বৌ হয়ে দাঁড়াল? ভাগ্যিস্ ওর মা-মাগীর চিঠিখানা আমার হাতে এসে পড়ল, নইলে তো খোরপোষ আদায় কোরে ছাড়ত দেখ্‌ছি! আমার স্কন্ধে চেপে-বোসে তার পর যদি প্রকাশ করত তা হলে সিন্ধবাদের ঘাড়ের বুড়োর মতন ছাড়ানো দায় হত! সনৎ-ডাক্তার আমার কুলে কালি দিলে! বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা! বাছাধনকে আমি টেরটি পাইয়ে নাকের জলে চোখের জলে কোরে ছাড়্‌ব—তখন বুঝ্‌বেন কার সঙ্গে চালাকি? ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ ত দেখেননি!

পরিতোষ একদিন মলিনাকে আয়ত্ত করিবার জন্য কত চেষ্টা জোগাড়ই না করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আজ যেই সে টের পাইল যে সে তারই বিবাহিতা স্ত্রী, অমনি তার সকল উৎসাহ উবিয়া গেল। সে যে নিজের অসহায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া তার পথভ্রষ্ট হইবার কারণ হইয়াছে তার জন্য নিজেকে না দুষিয়া, সনৎ যে তার স্ত্রীকে আশ্রয় দিয়াছিল সেই আক্রোশেই সে ভীষণ উগ্র হইয়া উঠিল।

(৩৫)

রাঘবকে পাঠাইয়া দিয়া একাকী মলিনা এতক্ষণের উত্তেজনার পর আবার শিথিল অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে হতাশ নিরাশ্রয় মনে ভাবিতে লাগিল তার অদৃষ্টের জটিল গহন রহস্য! যাকে সে ভালোবাসে সে তার

কেউ না, আর যাকে সে ঘৃণা করে সেই তার স্বামী—তারই আশ্রয়ে গিয়া থাকিতে হইবে! যাকে সে ভালোবাসে তার কাছে থাকিলে সমাজ চোখ রাঙাইবে এবং যাকে সে ঘৃণা করে তার কাছে থাকিলে সমাজ সতী-সাধ্বী বলিয়া বাহবা দিবে! সমাজের কৃত্রিম শাসনের ভয়ে ও বাহবার লোভে সে বিচলিত হইয়াছে ভাবিয়া লজ্জায় ঘৃণায় তার অন্তর তাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল, নিরুপায় নিরাশ্রয় হইলে কি চরিত্রও এত নীচ দুর্ব্বল হইয়া যায়! একটা লোক শুধু বিবাহের মন্ত্র পড়িয়াছিল এই সম্পর্কেই তার কাছে গিয়া থাকিবার প্রবৃত্তি তার কেমন করিয়া হইতে পারিল! ছি ছি ছি! পরিতোষ যদি এই নির্লজ্জ উপযাচিকাকে অপমান করিয়া প্রত্যাখ্যান করে! তবেই সেই শাস্তিতে এই লজ্জা বুঝি ঢাকা পড়িলেও পড়িতে পারে। মলিনা মনে মনে কামনা করিতে লাগিল পরিতোষ যেন তাকে গ্রহণ করিতে স্বীকার না করে। কিন্তু পরিতোষও আশ্রয় না দিলে তার গতি কি হইবে? মলিনার হঠাৎ মনে পড়িল তারকেশ্বর গিয়া ও বোটানিকাল গার্ডেনে গিয়া যে-সব মেয়েদের দেখিয়া সে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়াছিল তাদের। সে কি তবে তাদেরই দলপুষ্টি করিতে যাইবে! তার মা তাকে লেখাপড়া শিখাইয়া সম্মানের পথে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার উপযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে সে কতটুকুই বা শিখিয়াছে এবং কোথায়ই বা সাধু উপার্জ্জনের ক্ষেত্র তাও ত সে জানে না! তবে কি পাপপঙ্কে নিমজ্জন থেকে বাঁচিতে তাকে মরিতে হইবে!

ভাবিতে ভাবিতে তার চোখ দিয়া সমস্ত দুঃখ বেদনা হতাশা ভয় স্রোত বহিয়া বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। বিকালবেলা হইতে যে ঝড়জলের আয়োজন বাহিরের আকাশেও চলিতেছিল তাহাও এখন প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা দেখিয়া আশ্রয়ের সঙ্গে নিরাশ্রয়ের তুলনার বিভীষিকা

তার মনে আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। মলিনা আপনাকে কান্নায় গলাইয়া বাহিরের ঝড়ঝাপ্‌টার মধ্যে মিলাইয়া উড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া আপনার নিকট হইতেই যেন পরিত্রাণ পাইতে চাহিতেছিল।

আগাগোড়া ভিজিয়া রাঘব আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতেই মলিনা উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল —কি হল রাঘব?

রাঘব মাথা নাড়িয়া বলিল—পরিতোষ-বাবু তাড়িয়ে দিলে দিদিমণি। বল্‌লে—তোর দিদি-ঠাকৃরুণ একদিন আমায় যা বল্‌তে বলেছিল, তাই তাকে ফিরিয়ে বল্‌গে যা।

মলিনা এই কথায় সুখীও হইল, কাতরও হইল—আশ্রয় পাইবার শেষ সম্ভাবনাটুকুও ত গেল। মলিনার চোখ দিয়া আকুল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রাঘব মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল—দিদিমণি, আমি বাবুর কাজে ইস্তফা দিয়েছি, আজ বাড়ী যাব।

মলিনার বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া ঘা লাগিল—শেষ চেনা লোকটিও বিদায় লইতেছে! মলিনা মরীয়ার সাহস বুকে বাঁধিয়া বলিল—বেশ! তুমি আমার অনেক উপকার করেছ রাঘব, কিন্তু নিঃসম্বল আমি কিছু দিয়ে ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার্‌ব না, যতক্ষণ বাঁচ্‌ব তোমার গুণ ভুল্‌ব না।

মলিনা বলিতে পারিল না যতদিন বাঁচ্‌ব, বলিল—যতক্ষণ। তাকে মরিতেই যে হইবে ইহা সে মনে মনে স্থির করিয়া তুলিতেছিল।

রাঘব মুখ কাচুমাচু করিয়া বলিল—আমায় একটি ভিক্ষা তোমায় দিতে হবে দিদিমণি—ইচ্ছে করলেই তুমি তা দিতে পারবে।

মলিনা বুড়া রাঘবের এমন অবস্থাতেও লোভ দেখিয়া কান্নার মাঝে হাসিয়া বলিল—কি রাঘব?

রাঘব আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল—আমি বাবুর চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলেছি। আমরা তাঁতি, বাড়ীতে বুড়ী আর বিধবা মেয়েটা মিলে একখানা তাঁত চালায়; আমি গিয়ে আর-একখানা তাঁত বসাব। তুমি যদি দয়া কোরে আমার কুঁড়েতে পায়ের ধূলো দাও দিদিমণি, আমরা তিনজনে তোমার চরণ সেবা কোরে দুটি দুটি পেসাদ পাব।

মলিনা আশ্চর্য্য অবাক হইয়া রাঘবের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল বুড়ার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতেছে, তার উপর বিদ্যুতের আলো পড়িয়া সেই অশ্রুবিন্দুগুলিকে হীরার চেয়েও অমূল্য করিয়া তুলিতেছিল! মলিনা অকূল অতল সমুদ্রে আশ্রয় পাইয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিয়া উঠিল—তাই চলো রাঘব, তাই চলো, আমিও শীগ্‌গিরই তাঁত বুন্‌তে শিখে নেবো!

তখন বাহিরের অন্ধকারে বিদ্যুতের হাসি ঝলক খেলিয়া গেল।

(৩৮)

সনতের কলিকাতার বাসায় আর মলিনাও নাই, রাঘবও নাই, এখন খোট্টা খানসামা রামভরোসা সনতের ভরসা। সনৎ মলিনার শূন্য মন্দিরে অভিশপ্ত ভক্তের মতন কাতর অনুতপ্ত হৃদয় লইয়া পড়িয়া থাকে; সে চিকিৎসা ছাড়িয়াছে; পরিতোষের দুর্ম্মুখের কুৎসা ও গালাগালিতে সনতের মিথ্যা দুর্ণাম নিত্য রটিতেছে।

সুবাসিনী পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত নবজাত কন্যাকে দিয়া হারানো স্বামীকে ফিরিয়া বাঁধিবার দুরাশায় কন্যার নাম রাখিয়াছে মলিনা! কিন্তু তবু ত তার স্বামীকে সে ফিরাইতে পারিতেছে না। তারও মন অনুতাপে ক্লিষ্ট সন্তপ্ত। সে স্বামীকে পাইবার লোভে মলিনাকে তাড়াইল, কিন্তু স্বামীকে পাইল কৈ? যে দুর্ণামের ভয় সে করিয়াছিল, তাহা

কি নিবারণ করিতে সে পারিল? নিরাশ্রয়কে বিতাড়িত করার পাপই শুধু অর্জ্জন করিল, তার অভিসম্পাতে সুখ যাও ছিল তাও যে গেল!

সনৎ যদি কখনো বাড়ীতে আসে তবে সুবাসিনীর সঙ্গে কথা বলিবার বিষয় খুঁজিয়া পায় না, মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা লজ্জার সঙ্কোচ অনুভব করে; এবং সুবাসিনীও নিজেকে স্বামীর অসুখের কারণ অনুমান করিয়া সর্ব্বদা অপরাধী হইয়া থাকে। তাদের দুজনকে অন্তরাল ও পৃথক করিয়া সর্ব্বদা মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া আছে তাদের দুজনের বিতাড়িতা মলিনা! তার স্থান এই শিশু মলিনা যদি কখনো কাড়িয়া দখল করিতে পারে তবেই এ বিচ্ছেদ ঘুচিয়া মিলন ঘটিবে—নতুবা এই শেষ।